পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

মৃন্ময় ভারতী

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI1200918

বর্ষ-২০১৮

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

উৎসর্গ

আমার শিক্ষাগুরু

স্বর্গীয়

শুভাশিস বিশ্বাসকে

Certificate

Certificate that the thesis entitled **পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১)** Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor	Signature of the Candidate
Date: -	Date:-

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণাপত্রের জন্য প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় শ্রী শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়কে। তিনি সবসময় বিভিন্ন ভাবে আমাকে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টাকে পাথেয় করে আজ আমি এই গবেষণা প্রাবন্ধ করেছি। ২০২০ সালের বিশ্ব অতিমারী তাঁকে আমাদের থেকে কেড়ে নেয়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমার প্রতি তাঁর যে আস্থা ছিল তারই মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার এই গবেষণা তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার মহাশয়াকে। তিনি শুধুমাত্র আমার তত্ত্ববধায়ক নন, আমার আগামীর প্রেরণা। আমার শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় শ্রী শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়কে হারিয়ে ফেলার পর আমি একপ্রকার দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। তখন খুবই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ওই সংকটজনক পরিস্থিতে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন আমার মাতৃরূপি তত্ত্বাবধায়ক। তিনি শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও আমার এই গবেষণার কাজকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় পরামর্শ দিয়ে গেছেন। যখনই সমস্যায় পড়েছি তখনই তিনি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপত্য স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা, বিশ্বাস ও স্নেহের কারণেই আমি গবেষণাপত্রটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী আমাকে তাঁর কাছে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমি চিরঋণী আমার প্রতি এতটা বিশ্বাস রাখার জন্য, সর্বোপরি আমি চিরঋণী

আমাকে মাতৃস্নেহে আগলে রাখার জন্য। তাই তিনি শুধুমাত্র আমার একজন তত্ত্বধায়ক নন, আমার কাছে তিনি আমার মা, আমার ঈশ্বরসম।

আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত ও অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল মহাশয়কে, যাঁরা নানা সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা সহযোগী কর্মীদের যাঁদের বিভিন্ন পরামর্শ ও আন্তরিক সাহায্য এই গবেষণার পথকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই পি.এইচ.ডি সেলের মেহেলী দি সহ অন্যান্য সকল কর্মীকে, যাঁরা এই গবেষণার কাজে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। গবেষণাটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ক্যানিং বসন্তসেন গ্রন্থাগার, স্টেট আর্কাইভ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাই উক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের জয়েন্ট কোঅরডিনেটর পঙ্কজ সমাদ্দার, কোঅরডিনেটর রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, রাঙ্গাবেলিয়া মহিলা সমিতির সভানেত্রী প্রতিমা মিশ্র, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিত মহাকুড়, সভাপতি হরেকৃষ্ণ ভারতী, কর্মী দীলিপ সরদার, গোসাবা ব্লক উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক জয়েন্ট বিডিও, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক, গোসাবা সেচ দপ্তরের আধিকারিক মহাশয়দের, যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া তথ্য সংগ্রহের কাজটা সম্পূর্ণতা পেত না। ধন্যবাদ জানাই আমার

গবেষক দাদা শুভদীপ দাস, শুভঙ্কর দে, অলোক করা, ঋতুশ্রী বসু দি এদের থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই শুভদীপ দা ও ঋতুশ্রী দিদিকে, যাঁরা বিভিন্ন সময় নানা ভাবে আমার পাশে থেকেছে, আমাকে সাহায্য করেছে। আলাদা ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বান্ধবী মিঠুকে, যে আমাকে গবেষণার কাজে নানা ভাবে সাহায্য করে গেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসমস্ত সুন্দরবনবাসীদের, যাঁরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমার গবেষণাপত্রটিকে আরও তথ্যনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমার পরিবার (বাবা, মা, দিদি) থেকে যে সমর্থন, স্নেহ-ভালোবাসা, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে এসেছি সেই সমর্থন ও ভালোবাসা ছাড়া আমি কখনই আমার এই গবেষণাকে সম্পন্ন করতে পারতাম না। তাই আমার পরিবারের প্রতি আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আলাদা করে বলতে চাই আমার বাবার কথা যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের জন্যই আজ আমি এই জায়গাতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর এই হার না মানা মানসিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত মানুষগুলোকে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে।

মৃন্ময় ভারতী

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার		i-iii
সারণীসূচী		
ভূমিকা		১-২৪
প্রথম অধ্যায় :	স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের অবস্থা ও উন্নয়নের প্রগতিশীলতা	২৫-৫২
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে সুন্দরবনের বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্র	৫৩-১০৪
তৃতীয় অধ্যায় :	সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ	১০৫-১৪০
চতুর্থ অধ্যায় :	বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদ	১৪১-১৮৪
পঞ্চম অধ্যায় :	সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী	১৮৫-২০৮
উপসংহার		২০৯-২১২
গ্রন্থপঞ্জি		২১৩-২৩৫
পরিশিষ্ট		২৩৬-২৫৯

সারণীসূচী

২.১. ১৯৭০-২০১১ পর্যন্ত সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকা।

২.২. ১৯৫১-২০১১ পর্যন্ত সুন্দরবনের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যান।

২.৩. সারিবদ্ধ বনায়নের দ্বারা ১৯৮১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত লাগানো গাছের পরিসংখ্যান।

২.৪. ম্যানগ্রোভ বনায়নের দ্বারা ১৯৮২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত লাগানো গাছের পরিসংখ্যান।

২.৫. বাগিচা বনায়নের দ্বারা ১৯৮২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত লাগানো গাছের পরিসংখ্যান।

২.৬. সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের দ্বারা সামাজিক বনায়নের জন্য ব্যয় করা অর্থের পরিসংখ্যান।

৩.৭. রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের পাড়া মিটিং এর পরিসংখ্যান

৩.৮. রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের শিক্ষা বিভাগের সফলতার তালিকা।

৩.৯. বাসন্তী ব্লকের দরিদ্রতার চিত্রের তালিকা।

৪.১. সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার সময়সূচী।

৫.১. সুন্দরবনের নারীশিক্ষার হার।

ভূমিকা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের পরিবেশ ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য এবং দীর্ঘকালের। পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণার বিষয়টি সুন্দরবনের পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজজীবন, বনসম্পদ, জলসম্পদ, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে। উল্লিখিত গবেষণা পত্রটির সময়পর্ব হিসাবে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছি। ১৯৪৭ এবং ২০১১ সালকে গবেষণার জন্য কেন নির্বাচন করলাম তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। ১৯৪৭ সালকে নির্বাচন করেছি কারণ- এই সালে ভারত দীর্ঘ একশো-নব্বই বছরের ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই স্বাধীনতা ও দেশ বিভাজন সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের উপরে গভীর আঘাত করেছিল, কারণ এই বিভাজন এতদিনের গড়ে ওঠা সামাজিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। তাই ১৯৪৭ সালের এই যুগসন্ধিক্ষণকে গবেষণাপত্রের শুরুর সাল হিসাবে নির্বাচন করেছি। ২০১১ সালকে নির্বাচনের কারণ হল ১৯৪৭ সালের মত ২০১১ সালেও দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। তাই এই রাজনৈতিক কালপর্বটিকে গবেষণার সুবিধার্থে গ্রহণ করেছি। সুন্দরবনের পটভূমিতে এই কালপর্বের একটি নির্দিষ্ট অবয়ব তৈরি হয়েছিল, যা এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ২০১১ সালের আদমশুমারি আমার গবেষণার সালকে ২০১১ পর্যন্ত নির্বাচন করার গুরুত্বকে বাড়িয়ে

দিয়েছে। দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, বর্গা আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মরিচঝাঁপি প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাবলী সুন্দরবনের সমাজ ও পরিবেশ ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। নিম্নবর্গের মানুষ ও তাদের অবস্থানের বিষয়টি এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু।

সুন্দরবনের অবস্থান

নিম্নবঙ্গীয় অঞ্চলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের মোহনায় বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে পলি সঞ্চয়ের ফলে এশিয়া তথা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যে দ্বীপ গড়ে উঠেছিল তার নাম সুন্দরবন। আজ থেকে কয়েকশো বছর পূর্বে প্রাচীনকালে সুন্দরবনের যে কি নাম ছিল সেটা অনুমান সাপেক্ষ। নামকরণ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও বর্তমানে সুন্দরবন নামটি সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের আগে সুন্দরবনের অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে ভারতের অধীনস্থ ছিল। তারপর ভারত বিভাজনের সাথে সাথে সুন্দরবনের অবস্থানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভাজিত। প্রায় ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান, যার তিন ভাগ বাংলাদেশের অংশ। ভারতীয় সুন্দরবন ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে বাদাবন অর্থাৎ শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল - ৪,২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। এই বনাঞ্চলের মধ্যে ২৩৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকাতে শুধুমাত্র বনভূমি গড়ে উঠেছে এবং বাকি ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাতে সুন্দরবনের জলাভূমি। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প- ২,৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পের বহির্ভূত অঞ্চল ১৬৮১ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনের বন হাসিল করে গড়ে ওঠা লোকালয়, কৃষিজমি ও নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের ভেড়ীর আয়তন ৫৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার।

জনবসতিপূর্ণ এলাকা ৪৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার।[১] ভারতীয় সুন্দরবনের মানচিত্রের ভৌগোলিক অবস্থান হল পশ্চিমে হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল নদী তথা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমানা বরাবর জল-জঙ্গলেপূর্ণ বিশাল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। ভারতীয় সুন্দরবনের মধ্যে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২ টি। জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ ৫৪ টি এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪৮ টি দ্বীপ এবং অভয়ারণ্য তিনটি (সজনেখালি, লোথিয়ান দ্বীপ ও হ্যালিডে দ্বীপ)।

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে সুন্দরবন অঞ্চলটি ২১°৩২´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°২৮´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।[২] সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করেছিল ড্যাম্পিয়ার ও হজেস নামক দুই বিখ্যাত ব্রিটিশ জরিপবিদ। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৯ টি ব্লক নিয়ে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ব্লক, সেগুলি হল- হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, হাসনাবাদ। এইগুলি সবই জনবসতিপূর্ণ এলাকা, উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে কোনো গভীর জঙ্গল নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৩ টি ব্লকের মধ্যে সুন্দরবনের অবস্থান। সেগুলি হল- গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, কুলতলি, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর। সুন্দরবনে মোট তিনটি লোকসভা কেন্দ্র- জয়নগর, মথুরাপুর ও বসিরহাট।[৩] মহকুমা- ৫টি, গ্রাম পঞ্চায়েত- ১৯০টি, মৌজা- ১০৮৫টি, গ্রাম- ১০৬৪টি, থানা- ১৭টি, উপকূলীয় থানা- ৩টি, মোট ব্লক- ১৯টি। সুন্দরবনে অনেক নদীর অস্তিত্ব বর্তমান, সেগুলোর মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী নিম্নরূপ- রায়মঙ্গল, মাতলা, বিদ্যাধরী, ঝিলা, ঠাকুরান, হরিণভাঙা, পঞ্চমুখী, হোগল, সপ্তমুখী, মুড়িগঙ্গা, পিয়ালি, হুগলী, মনী, করতাল, কালিন্দী প্রভৃতি। সুন্দরবনের

মোট নদীবাঁধের দৈর্ঘ্য ৩৫০০ কিলোমিটার, যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণাতে-১২০০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ২৩০০ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪২ লক্ষ, যার মধ্যে ৫২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৮ শতাংশ মহিলা। কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগণের সংখ্যা প্রায় ৮৫ শতাংশ। তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রায় ৪৪ শতাংশ।[৪] মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০০টি, কলেজ ১০টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২০টি, হাসপাতাল ১০টি। সুন্দরবনবাসীর প্রধান জীবিকা হল- কৃষি এবং উপজীবিকা হল মাছধরা, কাঠ, মধু ও মোম সংগ্রহ ইত্যাদি।[৫] পর্যালোচনা ও গবেষণার জন্য সুন্দরবনকে পাঁচটি মূল উপভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি হলো- ১. উত্তরে ন্যাজাট- সন্দেশখালি অঞ্চল, ২. উত্তর-পশ্চিমে- ক্যানিং অঞ্চল, ৩. পশ্চিমে- কাকদ্বীপ অঞ্চল, ৪. পূর্বে- গোসাবা অঞ্চল, ৫. দক্ষিণ-পূর্বে- সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অঞ্চল।

তাত্ত্বিক আলোচনায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র

'সামাজিক বাস্তুতন্ত্র' বলতে ঠিক কি বোঝায় সে বিষয়ে গবেষণার শুরুতে আলোচনা করে নেওয়া আবশ্যক। এককথায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি বাস্তুতন্ত্রের এক নতুন সংযোজন। আমরা যদি জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তুতন্ত্রকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখব একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোনো একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জীব এবং সেই অঞ্চলের জড় উপাদানের সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য উৎপন্ন উপাদানের যে বিনিময় ঘটায় তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। বাস্তুতন্ত্র হল একটি সামগ্রিক ক্রিয়া পদ্ধতি, যার দ্বারা যে কোনো স্থান বা অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী, জড় প্রভৃতি

সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন গড়ে ওঠে। একই ভাবে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রও হল একটি ব্যবস্থাপনা। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে 'সমাজবদ্ধ সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি অলিখিত ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে'। এককথায় সুন্দরবনের সমাজ, মানুষ, জীব, জন্তু, আকাশ, বাতাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়কে একটা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ রাখাকেই সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলছি। রামচন্দ্র গুহর মতে বাস্তুতন্ত্র সমাজ বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে সামাজিকক্ষেত্রে। সমাজের উন্নয়ন, বিবর্তন ও অভিযোজনমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে।[৬]

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সামাজিক ও পরিবেশগত দর্শনের ধারাকে বাস্তবিক দিক থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র নামে একটি ভাবাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বাস্তুতন্ত্র বলতে জীবকূল ও পরিবেশকেই বোঝায়, কিন্তু সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল এমন একটি দর্শন যেখানে মানুষ এবং মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কিত পরিবেশের কথা উঠে আসে।[৭] সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই দর্শন আমাদের এই পৃথিবীকে সচেতন করে তুলতে ও তার নিজস্ব প্রতিফলন ঘটিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের কথা বলে।[৮] সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল একটি সুসংগত পরিকাঠামো যা বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ বিরোধী প্রবণতার তীব্র সমালোচক। সেইসঙ্গে সমাজের কাছে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোর পুনর্গঠনের নৈতিক আবেদন জানায়। সুতরাং এককথায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল মানবগোষ্ঠী এবং পরিবেশের মধ্যেকার একে অপরের সাথে সম্পর্কিত একটি দর্শন। পরিবেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মানুষের বিশেষত দুর্বল, প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের ভাবনাটিও বোঝাতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের বেশকিছু মৌলিক শ্রেণীবিভাজনের কথা বলেছে। সেগুলি হলো- ১. অর্থনীতি, যার মধ্যে শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্ক, পণ্য পরিষেবা বন্টন ও বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে ২. রাজনীতি বা ক্ষমতার সম্পর্ক, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর, প্রতিষ্ঠান, আইন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে ৩. সামাজিক কাঠামো, যেখানে পরিবার, আত্মীয়তা, জাতি এবং সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে ৪. সংস্কৃতি, যার মধ্যে শিল্পকলা, ধর্ম এবং আদর্শের কথা বলা হয়েছে ৫. জৈবিক কাঠামো, যার মধ্যে মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণীকুল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।[৯] এই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলির সম্মিলিত ধারণা ও মতাদর্শ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিবেশগত কাঠামোর অবস্থার পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের দিক নির্দেশনা পরিচালিত হয়, তেমনভাবে অন্যদিকে মানুষের অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ প্রাকৃতিক পরিবেশকে 'পুনর্বিকৃত' করে তোলে। রামচন্দ্র গুহ তাঁর Social Ecology গ্রন্থে বলেছেন যে, সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল- সচেতনতার ওপর নির্ভর করে পরিবেশগত কাঠামোর সাথে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক স্থাপন।[১০]

'A Social Ecology' প্রবন্ধে জন ক্লার্ক দেখিয়েছেন যে, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে সত্ত্বাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক মাত্রার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও বাস্তুতান্ত্রিক একটা সম্পর্ক গড়ে তুলছে, যেটি আমাদের প্রকৃত মানব এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণে সাহায্য করে।[১১] ফরাসী ভূগোলবিদ এলিসি রেক্লাস (১৮৩০-১৯০৫) একটি সুদূরপ্রসারী সামাজিক ভূগোলবিদ্যার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন

করেছিল, আর এই সামাজিক বাস্তুবিদ্যাই মানব সমাজের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ককে খুঁজে চলেছে। হোমো স্যাপিয়েন্সের উত্থান থেকে শুরু করে নগরায়ণের প্রসার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন এবং প্রাথমিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রভৃতি সবকিছুই সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের পরিধির অন্তর্গত। এলিসি রেক্লাস প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে একটি মুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজের কল্পনা করেছেন।[১২]

রেক্লাসের চিন্তাভবনাকে আরও বিস্তৃত করেন স্কটিশ উদ্ভিদবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডেস। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে মানব সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার এক প্রগতিশীল আন্তঃসম্পর্কের দার্শনিক বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর কাজকে জীবমণ্ডলের দার্শনিক অধ্যয়ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গেডেস পার্শ্ববর্তী সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত অঞ্চলের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে একটি বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রদায় গঠনের ওপর জোর দেন। এছাড়াও তিনি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের প্রস্তাব দেন, যা মানবিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে।[১৩] সুতরাং গেডেস এইভাবে একটি সাংগঠনিক উন্নয়নশীল সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলেন। গেডেস তাঁর কাজকে 'Place Work and Folk' মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেন। এই ভাবে তিনি তাঁর কাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'সমাজবিজ্ঞান' নামক সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের একটি উন্নয়নমূলক জৈব-আঞ্চলিক দিকের বিকাশের কথা বলেন।

বর্তমানে সামাজিক-বাস্তুতন্ত্র তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্লার্ক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সংকট এবং অবনতি সম্পর্কে সচেতনতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক-বাস্তুতন্ত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাঁর

ভাষায় “will certainly gain impetus through the awareness of global ecological crisis and deterioration of the community”।[১৪] তিনি সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী, কারণ তিনি মনে করেন প্রকৃতির কাছে মানবজাতির যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে সেটা মেনে নিয়ে একটা সুন্দর প্রাকৃতিক সমাজ গড়ে উঠবে।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রচর্চাকে তত্ত্বগত দিক থেকে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন মারে বুকচিন। প্রথমদিকে তিনি সমাজ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে কিছু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও পরবর্তীকালে রেক্লাস, গেডেস ও মামফোর্ডের সাম্প্রদায়িক, সাংগঠনিক ও আঞ্চলিকতাবাদের ধারণাকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এককথায় বুকচিন সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ঐতিহ্যকে আরও বিকশিত ও প্রসারিত করেন। তাঁর কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি পরিবেশগত সংকটে উন্নয়নশীল বিশ্ব পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভূমিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আমাদের সমাজ (যে সমাজে আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি) ও সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা সম্পর্কেও একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ‘Social Ecology Versus Deep Ecology : A Challenge for the Ecology Movement’ নামক প্রবন্ধে বুকচিন দেখান যে, সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল প্রকৃতিবাদের একটি সুসংহত রূপ যা জীবমণ্ডলের ক্রমাগত বিবর্তনের দিকে আমাদের ইঙ্গিত দেয়।[১৫] প্রকৃতি থেকে মানুষ ও সমাজকে আলাদা করার অর্থ প্রাকৃতিক বিবর্তনের গুরুত্বকে হ্রাস করা। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাছে প্রকৃতি হল ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফসল; যা বাস্তবে অনু ও পরমানু দ্বারা গঠিত। এই অনু এবং পরমাণু আবার অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, এককোষীতে বিবর্তিত জীব, জেনেটিক কোড, অমেরুদণ্ডী,

মেরুদণ্ডী, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী সর্বোপরি মানুষের বিবর্তনে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ এই সবকিছু একটা বৃহতর জটিল বিবর্তনবাদের অংশস্বরূপ এবং পৃথিবীতে জৈব বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের সর্বশেষতম বিকাশ হল মানুষ। কেবল জীবগত বিবর্তনই নয়, বুকচিন সামাজিক স্তরক্রম এবং আধিপত্য-অধীনতার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এখান থেকেই প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ববাদের ধারণার উদ্ভব হয়। তাঁর মতে প্রকৃতির ওপর মানব সমাজের আধিপত্য এবং প্রকৃতির ধ্বংস একঅর্থে সামাজিক বৈষম্য বা স্তরভেদকেই (Social Hierarchy) সুনিশ্চিত করে।[১৬] এর থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তিনি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মত নৈতিক নীতিগুলির ওপর জোর দেন। তাই বলা যায় সামাজিক বাস্তুতন্ত্র চর্চা পরিবেশগত অপব্যবহারের প্রতিকার করতে চায়, তথা আধিপত্য বা স্তরভেদের পুরো ব্যবস্থাকেই একটা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে চায়। জীবজগৎ তথা সমগ্র পরিবেশের অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করতে মানবসমাজকে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র চর্চা আমাদেরকে ক্রমাগত সেই সত্যের কাছাকাছি উপনীত করছে।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দর্শন ও ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে আলোচ্য গবেষণায় সুন্দরবনের প্রেক্ষিতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহারিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের অনন্য ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য এখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি ও জীবনধারণকে প্রভাবিত করেছে ও সেইসঙ্গে এখানকার মানুষের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষজন ও অন্যান্য প্রাণীকূল এখানকার কঠোর পরিবেশগত বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং অভিযোজনের দ্বারা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এইরূপ গতিশীল পরিবেশে মানুষের জীবন সর্বদা প্রকৃতির দান। বসতি স্থাপনের

জন্য বন পরিষ্কার করা অথবা বনসম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা সবসময় সুন্দরবনবাসীদের একটা চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করায়। তাই সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সাপেক্ষে একটি ঐতিহাসিক গবেষণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী সুন্দরবনের ইতিহাসে, বিশেষত পরিবেশের নানা বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সুন্দরবনের বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র নিয়ে অনেক ধরণের তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন- Gazetteers, District Handbooks, Survey Report, Travel Books, Novels ইত্যাদি। এই সমস্ত উপাদানে সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি যে, সুন্দরবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সুন্দরবন নিয়েই গবেষণা হয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষণা যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। যেমন- রাজনৈতিক পরিকাঠামো, সুন্দরবনের উন্নয়ন সম্ভাবনা, ম্যানগ্রোভ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মৎস্যজীবীদের অবস্থা, আঞ্চলিক পরিবেশ, বিপর্যয় ইত্যাদি। এই সমস্ত গবেষণার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকলেও একথা বলা যায় যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সুন্দরবনের ইতিহাসে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দার্শনিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গবেষণার অভাব আছে, যা বর্তমান গবেষণাতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরবন নিয়ে কিছু মূল্যবান গবেষণার কথা উল্লেখ করতে হবে, যেমন- ঔপনিবেশিক আমলের আগে ১৬৬০ সালে ফরাসী চিকিৎসক পর্যটক Francois Bernier সুন্দরবনের বদ্বীপ ও বাঘ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। WW Hunter, তাঁর 'A Statisical Account of Bengal: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans' বইতে ১৮৭৫ সালের সুন্দরবনের বিস্তারিত বিবরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখেন। মূলত ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাস হলেও গ্রন্থটি সুন্দরবন সম্পর্কে জানার একটি উল্লেখযোগ্য আধার।[১৭] পরবর্তীকালে আরও অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক ঔপনিবেশিক আমলের সুন্দরবনের বিস্তারিত বিবরণ দেন, ঐতিহাসিক পলগ্রীনো বলেন যে, উনিশ শতকের সুন্দরবন মূলত সমুদ্রের উপর ভাসমান একটি বিপদজনক ব-দ্বীপ। H.S.Sen তাঁর 'The Sundarbans: A Disaster-Prone Eco-Region Increasing Livelihood Security' বইতে লেখক সুন্দরবনকে একটি আন্তঃসীমান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, যা দুটি দেশের অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশের পরিবেশবিদদের আরও নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। Sutapa Chatterjee Sarkar তাঁর 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals' বইতে সুন্দরবনের জমি উদ্ধার, কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন, পোর্ট ক্যানিং ও গোসাবার সমবায়ের উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান নদীর জোয়ার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুবই সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[১৮] Amit Bhattacharyya and Mahua Sarkar তাঁদের 'History and the Changing Horizon Science, Environment and Social Systems' বইতে অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল। নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদের প্রসারতাকে আঁকড়ে ধরার বিরুদ্ধে দেশীয়

জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, কীভাবে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের প্রবণতা পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে এনেছে যা প্রকৃতির সাথে সাথে মানবজাতিকেও প্রভাবিত করছে।[১৯] Annu Jalais তাঁর 'Forests of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans' বইতে সুন্দরবনকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বইটির মূখ্য উপাদান যদিও সুন্দরবনের বাঘ। তাঁর মূল প্রশ্ন হল 'সুন্দরবনের জন্য বাঘ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? বা সুন্দরবনের দ্বীপগুলোর জন্য বাঘ কতটা মহার্ঘ্য। এই প্রশ্নের উত্তর নানা জনগোষ্ঠী নানা ভাবে প্রদান করেছে। তবে বাঘ যে সমগ্র সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই মূল্যবান একটি সম্পদ সেটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন।[২০] Rup Kumar Barman, তাঁর 'Fisheries and Fishermen, A socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal' বইতে সুন্দরবনের মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিশ্লেষণ করেছেন।[২১] রঞ্জন চক্রবর্তী এবং ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী তাঁদের 'সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ' বইটিতে সুন্দরবনের আঞ্চলিক অর্থনীতি, সুন্দরবনের পরিবেশ, সুন্দরবনের ব্রিটিশ শাসন ও তাদের বাঘ শিকার, সুন্দরবনবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।[২২] অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল সম্পাদিত 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন' বইতে সুন্দরবনের সমগ্র দিকগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সুন্দরবনের ইতিহাস, রাজনীতি, কৃষি ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই আলোচনা করেছেন বইটির মধ্যে।[২৩] Seth Anandram Jaipuria College এর অধ্যাপিকা Suparna Bhattacharyya তাঁর 'A History of the Social

Ecology of Sundarbans: The Colonial Period' নামক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রে ব্রিটিশ আমলের সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের নানাদিক তুলে ধরেছেন। জগদীশচন্দ্র মণ্ডল তাঁর 'মরিচঝাঁপি নিঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইটিতে স্বাধীনতা-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা এবং দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের সাথে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে যে ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ তুলে ধরেছেন।[২৪] সন্দীপ দত্ত সম্পাদিত 'লিটিল ম্যাগাজিনে দেশভাগ' বইটির মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার এবং এই সমস্যা বাংলা সাহিত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা তুলে ধরেছেন।[২৫] সম্প্রতি Aviroop Sengupta তাঁর 'Tidal Histories: Envisioning the Sundarbans' প্রবন্ধে লিখেছেন কীভাবে ব্রিটিশ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার ভদ্রলোকরা সুন্দরবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে শুরু করেছিল।[২৬] এই বইটির সম্পাদকদ্বয় Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das তাঁদের সম্পাদকীয় বিবরণীতে সুন্দরবনের খণ্ড, খণ্ড বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক ইতিহাস যা আমরা বার্নাকুলার বা মাতৃভাষা থেকে আহরণ করি তার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, এই আঞ্চলিকতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের আঞ্চলিকতাকে ঐতিহাসিক ভাবে বোঝা যায়। 'Local history shows us how local particularities can put questions to totalising frameworks. For him, the global and the local do not necessarily stand in opposition to each other'।[২৭] Aparna Mandal তাঁর 'Sundarbans An Ecological History' বইতে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।[২৮] Amitav Ghosh তাঁর 'The Hungry Tide' বইতে প্রিয়া রায় নামক একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানীর একটি বিরল প্রজাতির ডলফিনের খোঁজে সুন্দরবনে আসার

কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের মধ্যে সুন্দরবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। একদিকে যেমন কুমিরের সাথে মানুষের লড়াই তেমনভাবে অন্যদিকে বাঘের কথাও উঠে এসেছে।[২৯] সতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' বইতে বৃহত্তর যশোহর ও খুলনা জেলার সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে সুন্দরবনের উত্থান, মানুষের বাসস্থান, সমাজ সংস্কৃতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বঙ্গদেশে পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ রাজত্ব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুন্দরবনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বইটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ।[৩০] উপরিউক্ত আলোচ্য গবেষণাধর্মী বইগুলো আমার গবেষণাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে এবং গবেষণাকে সঠিক দিশা দেখাতে সাহায্য করেছে।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি, কারণ সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হয়েছি। **প্রথমত,** স্বাধীনতার পরে সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা কেমন ছিল। **দ্বিতীয়ত**, স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানে সরকারী পদক্ষেপ কেমন ছিল? **তৃতীয়ত**, সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে সুন্দরবনের বনসম্পদ সত্যিই কি রক্ষা পেয়েছে? সেই প্রেক্ষিতে পরিবেশ আন্দোলনের কী ভূমিকা? **চতুর্থত**, বনসম্পদে ভরপুর সুন্দরবন কীভাবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে? **পঞ্চমত**, কীভাবে বেসরকারি প্রকল্পগুলি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে? এই প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের পশ্চাৎপদ মেয়েদের কী অবদান? **ষষ্ঠত**, সাহিত্য ও

অন্যান্য প্রাথমিক উপাদানের মাধ্যমে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বিশেষত নদীকেন্দ্রিক জীবন সম্পর্কে কি সন্ধান পাওয়া যায়? আমার গবেষণায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায় বিভাজন

গবেষণার সুবিধার্থে আলোচ্য গবেষণাপত্রটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে বিশ্লেষণ করেছি, যা সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে তুলে ধরেছি। প্রথম অধ্যায়, **'স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের অবস্থা ও উন্নয়নের প্রগতিশীলতা',** এই অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের ফলে কেমন ভাবে সামাজিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিভাজন ঘটেছে সেটা দেখানোর সাথে সাথে তৎকালীন সৃষ্টি হওয়া সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কেমন ভাবে উদ্বাস্তু মানুষের আর্তনাদ তৎকালীন পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল সেটা বিশ্লেষণ করেছি। নবনির্বাচিত সরকারের কাছে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে সরকার কি কি গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল সেটা দেখিয়েছি। এছাড়া এই সময় হয়ে চলা সুন্দরবনের বিভিন্ন আন্দোলন, যেমন তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জমিদারী উচ্ছেদ, বর্গা আইন একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। সুন্দরবনের উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসাবে ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন সরকারের সবথেকে বড় সাফল্য ছিল। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সূচনার পর থেকে সুন্দরবনের উন্নয়ন খুবই দ্রুত গতিতে হতে শুরু করেছিল। যেমন- ১৯৭৩ সালেই ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যাঘ্র প্রকল্প। ১৯৭৬ সালে পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত ভগবতপুর

মৌজায় সপ্তমুখি নদীর ধারে কুমীর প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। ওই বছরই আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছিল - সজনেখালীতে ৩৬২ বর্গ কিলোমিটার, লেথিয়ান দ্বীপে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপে ৬ বর্গ কিলোমিটার এবং মাতলা নদীর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের ৫৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকার ১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবনের সম্মানে নতুন পালকের সংযোগ হয়েছিল অর্থাৎ ওই দিনে আন্তর্জাতিক সংস্থা UNESCO সুন্দরবনের জাতীয় উদ্যানকে বিশ্বের ঐতিহ্যশালী স্থান (World Heritage Site) হিসাবে ঘোষণা করেছিল। ১৯৮৯ সালে ২৯শে মার্চ সমগ্র সুন্দরবনকে অর্থাৎ ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর গঠিত হওয়ার পর সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ আরও সুগঠিত হয়েছিল। এই ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সুন্দরবনের ইতিহাসে প্রগতিশীলতা তৈরি করেছিল।

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছি '**ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে সুন্দরবনের বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্র**'। এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি সুন্দরবনের ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা কিরূপ। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা অমূল্য সম্পদ হল বনসম্পদ। অরণ্যে বসবাস করা মানুষ যখন পাথরে পাথরে ঘষে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, মানব সভ্যতার সেই ঊষালগ্ন থেকে বনসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের ইতিহাসে সুন্দরবনের বনসম্পদের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ, বিশেষ করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের পরিবেশগত গুরুত্ব, যার ব্যাপ্তি

আঞ্চলিক স্তরের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বন সম্পদের দুটি দিকের গুরুত্ব সবথেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব খ) পরিবেশগত গুরুত্ব। বনসম্পদের গুরুত্ব ছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে বন আইন ও পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বনের এই গুরুত্ব বনসম্পদের কারণে এবং এই বনসম্পদের সঠিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যই বনআইন তৈরি করা হয়েছিল। বনসম্পদের সংরক্ষণের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য, কিন্তু সর্বদা এই সহযোগিতা পাওয়া যায় না, তখন আইন প্রণয়নের দ্বারা বনসম্পদের রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প থাকে না। তাই বনসম্পদের রক্ষার জন্য সৃষ্ট আইনকেই আমরা বনআইন বলছি। অন্যদিকে পরিবেশের রক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলনকে আমরা পরিবেশ আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেছি। সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস এবং পরিবেশ ভাবনা ও চর্চাতে পরিবেশ আন্দোলনের উল্লেখ করাটা একান্ত কাম্য। পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে সবার আগে সকলের মনে একটা প্রশ্নের জন্ম হয় যে, এই পরিবেশ আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? কারও মতে এই আন্দোলন সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে মানব সমাজেরই আন্দোলন। আবার কারও মতে পরিবেশ দূষণের শিকার সবাই হলেও দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার যারা কর্ণধার সেই শাসক ও বড় ব্যবসায়ী শ্রেণী, তাই এই আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই আমাদের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য অধ্যায়ে তেমনই কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। সুন্দরবনের পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরের ডোলা রোড

গ্রামের রাসায়নিক সার প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিপর্যয় থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে স্থানীয় পদক্ষেপ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ'**। এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। সুন্দরবনের সামগ্রিক গ্রাম উন্নয়নে সরকারি অবদান অনস্বীকার্য। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার ছাড়াও আরও অনেক সংস্থা, গোষ্ঠী ও সংগঠন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ওই সমস্ত সংস্থা বা গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও কার্যকলাপ সুন্দরবনের অগ্রগতিতে কতটা গতি প্রদান করেছে সেটাই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমি সুন্দরবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, এই সংস্থাগুলো সুন্দরবনের সর্বস্তরের উন্নয়নে কেমন ভাবে কাজ করছে। সংস্থা দুটি হল- ক) টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট খ) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র।

গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদ'**। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সুন্দরবনের ধারণাকে বাঙালি চেতনায় নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে সুন্দরবনবাসীর আঞ্চলিক জীবনের সামাজিক আখ্যান। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি

ধারাতে সুন্দরবনকেন্দ্রিক সমাজ জীবনের বার্তা বহন করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও গানের মধ্যে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার বন্ধনকে তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সুন্দরবনবাসীর সমাজ জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। সুন্দরবনের প্রতি ভালোবাসা, জীবিকার জন্য সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আড়ালে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামী জীবন প্রভৃতি ধরা পড়েছে সাহিত্যের মধ্যে। সুন্দরবনের সাহিত্যে নদীকে সবথেকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করে হয়েছে। সাহিত্যিক আলোচনা ছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের নদীসম্পদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। সুন্দরবনের নদী কীভাবে সুন্দরবনবাসীর জীবনকে আনন্দময় করে তুলছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি।

গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ করেছি **'সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী'**। এই অধ্যায়ে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী, অর্থাৎ সুন্দরবনের নারীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছি। নারী ও পুরুষ সকলের অবদান সমান সমান। নারীকে বাদ দিয়ে যে কোনো সভ্যতার মানোন্নয়নের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়। অথচ এই নারীরাই সমাজে অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়ে আছে। সুন্দরবনের ক্রমাগত সাফল্য ও উন্নয়নের পেছনে সুন্দরবনের নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীদের স্বনির্ভরতা ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই আমার আলোচ্য অধ্যায়ের বিচার্য বিষয় হল সুন্দরবনের নারীদের জীবন সংগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা এবং সেই বাধা সত্ত্বেও কিভাবে তারা সুন্দরবনের ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং সুন্দরবনের উন্নয়নে কিভাবে নিজেদের অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে সেটার বিশ্লেষণ করা। সেই প্রসঙ্গে রাঙ্গাবেলিয়া ও

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র নারীদের উন্নয়নে ও স্বনির্ভর করার জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেটা আলোচনা করেছি। সেইসঙ্গে অসহায় বিধবা, দরিদ্র মহিলাদের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জীবন সংগ্রাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কঠোর প্রতিকূলতার সামনেও হার না মানা মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার আরেক নাম সুন্দরবনের নারী সমাজ। এই সমস্ত বিষয়কে নিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি

আমার আলোচ্য গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রথম পর্বে সুন্দরবনকেন্দ্রিক বই পড়ে নিজের ধারণাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছি। এই সমস্ত বইগুলো সংগ্রহ করার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, ক্যানিং বসন্ত সেন গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, গোসাবা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করেছি। এছাড়া এই গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মূখ্য উপাদান পাওয়ার জন্য সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। যেমন- বন দপ্তরের প্রতিবেদন, অরণ্য দপ্তরের প্রতিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিবেদন, রাজ্য মহাফেজখানা ও ভারতীয় পরিসংখ্যানসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আদমশুমারির প্রতিবেদন, সেচ দপ্তরের প্রতিবেদন, রাঙ্গাবেলিয়া ও জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের তথ্য ও বাৎসরিক প্রতিবেদন, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর থেকে

প্রাপ্ত তথ্য, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের প্রতিবেদন প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আমার গবেষণার কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। এছাড়া সুন্দরবনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং মৎস্যজীবী, মধু সংগ্রহকারী, কাঠ সংগ্রহকারী, সরকারি আধিকারিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার গবেষণার কাজটিকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। সুন্দরবনের মত প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জানার জন্য উপাদান হিসাবে বই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, মুখের কথায় ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সুন্দরবনের ইতিহাস এমনকি বর্তমানের ইতিহাস বিষয়ে উপাদানের একান্ত অভাব। এই বাধা পেরিয়ে গবেষণার তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. Barun De, West Bengal District Gazetteers, South 24 Parganas, March 1994, Government of West Bengal. P- 715

২. A.K. Mandal and N.C. Nandi, Fauna of Sundarban Mangrove Ecosystem, West Bengal, India, Zoological Survey of India, 1989, p- 5

৩. Annual Report, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal.

৪. Census of India 2011, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৫. সুন্দরবন দিবস, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৪

৬. Ramachandra Guha, Social Ecology (New Delhi: Oxford University Press, 1994), p- 4

৭. Wikipedia 'Social Ecology', http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Ecology, Retrieved on 20.07.2022

৮. Clark John (art) 'A Social Ecology' (Anarchy Archives) http://library.nothingness.org/articles/anar/en/display/303, Retrieved on 20.07.2022

৯. Ramachandra Guha, Social Ecology (New Delhi: Oxford University Press, 1994), p- 5

১০. তদেব,

১১. Clark John (art) ‘A Social Ecology’ (Anarchy Archives) http://library.nothingness.org/articles/anar/en/display/303, Retrieved on 20.07.2022

১২. তদেব

১৩. Ramachandra Guha, Environmentalism: A Global History (London: Longmans Publications, 2000) p- 50

১৪. Clark John (art) ‘A Social Ecology’ (Anarchy Archives) http://library.nothingness.org/articles/anar/en/display/303, Retrieved on 20.07.2022

১৫. Bookchin Murray Art ‘Social Ecology versus Deep Ecology: A Challenge for the Ecology Movement’

http://dwardmac.pitzer.edu/AnarchistArchives/bookchin/socecol.html. Retrieved on 20.07.2020

১৬. Bookchin Murray Art ‘What is Social Ecology’

http://dwardmac.pitzer.edu/AnarchistArchives/bookchin/socecol.html. Retrieved on 20.07.2020

১৭. WW Hunter, Statisical Account of Bengal (Districts of the 24 Parganas and Sundarbans), Vol.1 (London: Trubner and Company, 1875)

১৮. Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals (New York: Routledge, 2017)

১৯. Amit Bhattacharyya and Mahua Sarkar, ed. History and the Changing Horizon Science, Environment and Social Systems (Kolkata: Setu Prakashani, 2014)

২০. Annu Jalais, Forests of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans (New Delhi: Routledge, 2010)

২১. Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen, A socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publication, 2008)

২২. রঞ্জন চক্রবর্তী, ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ (কলকাতা: রিসা রির্ডাস সার্ভিস, ২০০৭)

২৩. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতা: ছোঁয়া, ২০২০)

২৪. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাপি নি:শব্দের অন্তরালে (কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০২)

২৫. সন্দীপ দত্ত, লিটিল ম্যাগাজিনে দেশভাগ (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮)

২৬. Kaustubh Mani Sengupta and Tista Das, Rethinking the local in Indian history (New York: Routledge, 2022)

২৭. তদেব,

২৮. Aparna Mandal, Sundarbans an Ecological History (Kolkata: Readers Service, 2004)

২৯. Ghosh Amitav, The Hungry Tide (New York: Harper Collins, 2005)

৩০. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস (কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯২২)

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের অবস্থা ও উন্নয়নের প্রগতিশীলতা

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসকে বোঝার জন্য স্বাধীনতার পরে সুন্দরবনের রাজনৈতিক অবস্থাকে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সুন্দরবনের ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগের সাথে সাথে সুন্দরবনেরও বিভাজন ঘটেছিল, কিন্তু এই বিভাজন সমগ্র সুন্দরবনের এতদিনের গড়ে ওঠা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের পরিকাঠামোকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। এই বিভাজন সুন্দরবন তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রকে রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত করেছিল। সেই সঙ্গে দেশভাগকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ একটি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর সুন্দরবনের সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোর সাথে সরকারি নীতিগুলো সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের উপরে কতটা প্রভাব ফেলেছিল। অর্থাৎ মূল বিচার্য বিষয় হল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের অবস্থা। স্বাধিনোত্তর পর্বে নবনির্বাচিত সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা। দেশভাগের পর নিরাপত্তাহীনতার কারণে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় বিশেষত সুন্দরবনে যে পরিমাণ উদ্বাস্তু মানুষের আগমন হতে শুরু করেছিল সেটা নবনির্বাচিত সরকারের কাছে খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে ড. প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে জাতীয় কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই নবনির্বাচিত

সরকারের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১৬০ দিন। এই স্বল্প সময়কালে ড. ঘোষ সুন্দরবনের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তেমন কিছু করতে না পারলেও উদ্বাস্তুদের নিয়ন্ত্রণে কিছু দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল এবং এই হামলায় একজন কর্মী মারা গিয়েছিল। মনে করা হয় স্বাধীনতার পর এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাষ্ট্রীয় হত্যা।[১] আলোচ্য অধ্যায়কে আমি দুই ভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি- স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের সমস্যা ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সরকারী ভূমিকা ও পদক্ষেপ।

সুন্দরবনের উদ্বাস্তু সমস্যা ও সরকারী ব্যবস্থাপনা

দেশভাগের পর থেকে দলে দলে বহুসংখ্যক মানুষ পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। উদ্বাস্তু শরণার্থীদের কাছে ত্রিপুরা, আসামের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল প্রধান পছন্দের। অন্যদিকে দেশভাগের পর থেকেই যে উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটতে শুরু করেছিল এই কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী দাঙ্গার পর থেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাই আমরা বলতে পারি যে, দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দেশত্যাগের প্রবাহমানতায় মাঝে মাঝে যেমন গতি এসেছিল, তেমন ভাবে মাঝে মাঝে ধীর হয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কখনই থেমে যায়নি। দেশভাগ মূলত একটি ধারাবাহিক যাত্রাক্রমের সূচনা করেছিল। রাষ্ট্রীয় নাগরিক থেকে সংখ্যালঘু; সংখ্যালঘু মানসিকতা থেকে বাস্তুত্যাগ; উদ্বাস্তু হয়ে সীমান্ত অতিক্রম; তারপর স্টেশন, স্টেশন থেকে ক্যাম্প/কলোনি, ক্যাম্প থেকে নতুন বসতি নির্মাণের স্থান, এই দীর্ঘ যাত্রাপথই উদ্বাস্তুদের পরিচিতি নির্ধারণ করে। এই

যাত্রাপথের একপ্রান্তে ছিল বাস্তুচ্যুতি হওয়া এবং অপর প্রান্তে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা। এই যাত্রাপথের অভিমুখ সর্বদা দেশ থেকে রাষ্ট্রের দিকে ছিল। এখানে 'দেশ' হলো তার নিজের গ্রাম, চেনা-পরিচিত গন্ডি, আর অন্যদিকে রাষ্ট্র অর্থে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশীদার হিসাবে সে নিজেকে চিহ্নিত করেছে, সেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে ওই সময়ের শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রার যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন তা একপ্রকার নরকের সঙ্গে তুলনীয়- "যুবতী মেয়েরা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খোলা জায়গায় স্নান করছে, হাজার হাজার মানুষের ব্যবহার করা পায়খানা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে খোলা জায়গায় মানুষ ঘুমাচ্ছে। তিনটি ইট দিয়ে উনুন করে আবর্জনা জ্বালিয়ে রাস্তার পাশে রান্না করে খাবার খাচ্ছে। ...উদ্বাস্তুদের পটলা-পুঁটলি, নোংরা বিছানাপত্র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এত মানুষ এভাবে গাদাগাদি করে থাকায় প্ল্যাটফর্মের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়েরিয়া, বদহজম ও আমাশয় দেখা দিয়েছে।...সাপ্তাহিক মাথাপিছু দু-টাকা ও শুকনো চিঁড়ে গুড়ের বরাদ্দের(ডোল) জন্য কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনার জন্য মারামারি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, রোগ শোক প্রতিমুহূর্তের শ্বাসরোধকারী হাহাকার"।[২] এই সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের যদি পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু পরিবারগুলোর নিরাপদ বসবাসের ব্যবস্থা করে তাদের দেশত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে পারত এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছে তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারত তাহলে হয়ত এতটা সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হতনা। সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে

আলোচনা করলেও আগত উদ্বাস্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি।

১৯৪৮ সালের ১৬ ও ২২শে আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়কে দুটি চিঠি লিখেছিলেন, তার সারমর্ম ছিল এই যে- পূর্ব-পাকিস্থান থেকে ব্যাপক সংখ্যায় উদ্বাস্তু মানুষের আগমন হওয়াটা সমস্যার কোনও যুক্তিসম্মত সমাধান নয়। সুতরাং এই উদ্বাস্তু আগমন যেকোনো ভাবেই বন্ধ করতে হবে।[৩] এই দুটি চিঠি থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনকে রোধ করতে যতটা আগ্রহী ছিল, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অনীহা ছিল তাঁর থেকে প্রবল। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। ১৯৪৯ সালের ১লা ডিসেম্বর ড. বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে স্পষ্ট ভাষায় একটি চিঠি লিখে বলেছিলেন যে- কেন্দ্রীয় সরকার ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে অনুদান হিসাবে মাথাপিছু মাত্র ২০ টাকা করে প্রদান করেছে, যা পাঞ্জাবের তুলনায় এমনকি প্রয়োজনের তুলনায়ও অতি নগণ্য।[৪] ১৯৪৯ সালের ২রা ডিসেম্বর নেহেরুর আরও একটা চিঠি থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ভারত সরকারের মূল নীতির একটা বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। চিঠিতে বলা হয়েছিল যে-'ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখন এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে উৎসাহিত হয়'।[৫] অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এমনই কমিয়ে দিতে হবে, যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতবর্ষে আসতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং দেশত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের এই আগমনকে বন্ধ করতে না পেরে ভারত

সরকার উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রকে আরও শোচনীয়, কঠোর, পীড়াদায়ক করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের দেশত্যাগ বন্ধ করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তান সফরও করেছিলেন, কিন্তু সেই সফর তেমন ভাবে সফল হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সময় ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ সালের ২৫শে জুনের পর আগত কোনও শরণার্থীকে আর উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য করা হবে না এবং তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কোনও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না। ১৯৪৯ সালে ড. বিধানচন্দ্র রায় পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি হয়েছিল। এই আর্থিক সাহায্যের ফলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন ঘটেছিল, কিন্তু এর আগে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমনকে বন্ধ করার জন্য ঘোষণা করেছিল যে, ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চের পর পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও শরণার্থী আসলে তাদেরকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কোনও সাহায্য দেওয়া হবে না। সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না জেনেও ১৯৫৮ সালের পর আনুমানিক ৫৫,০০০ হাজার শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল।[৬] অর্থাৎ উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের ধারা একপ্রকার অব্যহত ছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, ১৯৭৪ সালের ১৬ মে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা 'ইন্দিরা-মুজিব' চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে, ভারত সরকার তাদের আর শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু সরকার স্বীকৃতি না দিলেও এই সময় থেকে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে

পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, যা সামাজিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে আঘাত করেছিল।[৭]

স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা সুন্দরবনের পরিবেশকে জটিল করে তুললেও এই প্রেক্ষাপটে এখানকার আবাদভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দেশভাগের ফলে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে দলে দলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটতে থাকে ২৪ পরগণা সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায়। মূলত সাতক্ষীরা, খুলনা, নোয়াখালী, বরিশাল থেকে এদের আগমন ঘটে। সুন্দরবনের বনজসম্পদ ও উর্বর ধান জমিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার জন্যই তারা এই এলাকা প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এছাড়া এই সমস্ত এলাকা থেকে নদী পথে খুব সহজেই আসার সুবিধা ছিল, যেটা অন্য স্থানের ক্ষেত্রে ছিল না। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ২৩,০৪,৫১৪জন। অথচ ১৯৫২ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ১,৯৩,৬৬৮ জন।[৮] সুন্দরবনে আগত উদ্বাস্তুদের সর্বাধিক সমাবেশ ঘটেছিল সন্দেশখালি ও গোসাবাতে। সন্দেশখালিতে বসতি স্থাপনযোগ্য জমির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকার ফলে ওই অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের আগমন সবথেকে বেশি হয়েছিল এবং শুরু হয় জঙ্গল হাসিল করে বসতি নির্মাণ প্রক্রিয়া। প্রথমদিকে সুন্দরবনে সরকারি উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের বসতবাড়ি তৈরির জন্য জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার প্রশংসা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভাষণের মধ্যেও শোনা যায়।[৯] ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে সুন্দরবনের উদ্বাস্তুদের স্থায়ী বাসস্থান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে- 'It is common in sparsely populated tracts such as the Sundarbans in 24

parganas,... Where there was until recently plenty of cultivable lands at low rentals.।[১০] পরবর্তীকালে বেআইনি ভাবে বহু উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হয়েছিল, যার কোন উল্লেখ সরকারি নথিতে পাওয়া যায় না। রাতের অন্ধকারে তারা বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল করেছিল। সুন্দরবনের বনজঙ্গল কেটে নিজেদের মত করে বাসস্থান তৈরি করেছিল। ফলে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল। সরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ছিল প্রধান কাজ, কিন্তু তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করাটা সরকারের কাছে খুবএকটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবুও সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৬-৭০ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সর্বমোট ৫২.৮৩ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হিসাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল, যার মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল ৩৯.৫৬ লক্ষ উদ্বাস্তু।[১১] তাই উদ্বাস্তু মানুষগুলো বনসম্পদে ভরা সুন্দরবনের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে।

কৃষক আন্দোলন (তেভাগা)

প্রাক স্বাধীনতা পর্বে অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনগুলোর মধ্যে তেভাগা আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ কৃষকদের অধিকারের দাবীতে সংগঠিত এই আন্দোলনে বাংলার প্রায় ষাট লক্ষ কৃষক, ভাগচাষী, বর্গাদার অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে এই আন্দোলন বাংলার জনমানসে একটা উজ্জ্বলতম স্থান দখল করেছিল। দুই চব্বিশ পরগণা বিশেষত সুন্দরবনের কাকদ্বীপ ও সন্দেশখালীতে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের গোসাবাতে একটু দেরিতে হলেও অন্যভাবে আন্দোলনটি ছড়িয়ে পড়েছিল। ‘লাঙল যার, জমি তার’, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জমিদারের অত্যাচার মানছি না, মানবো না, প্রভৃতি দাবী ও স্লোগানের মধ্যে

দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল। ১৯৪২ সালের ১৭ অক্টোবরের সাইক্লোন এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সুন্দরবনে তেভাগা আন্দোলনের বীজবপন করেছিল। আন্দোলনটি জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হলেও যখন সরকার জমিদারদের পক্ষ গ্রহণ করে তখন থেকে এই আন্দোলন সরকার বনাম কৃষকের বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। সরকারি দমন নীতির কাছে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিল। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে কাকদ্বীপ, সন্দেশখালি ও গোসাবার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি, কারণ এই আন্দোলনগুলি সুন্দরবনের কৃষকদের পরিবেশগত অবস্থানকেও নির্ণায়িত করেছিল।

সুন্দরবনের প্রতিটি অঞ্চলকে প্লট বা লটে ভাগ করে যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে লাটদার বলা হত। লাটদাররা নিজের জমি নিজেরা চাষ করতেন না। তারা জমি যাদের ইজারা দিতেন তাদের চাকদার বলা হত। ১৯৫১ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ৮২২৬ জন চাকদার ছিল (১৯৫১ সালের আদমশুমারির অনুযায়ী)। এমনভাবেই সরকার ও কৃষকদের মাঝে তৈরি হওয়া এই সব লাটদার, চাকদার নামক মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। সুন্দরবনের লাটদাররা নিজেদের লোভের কারণে কৃষকদের উপর খাজনা বাড়াতেই থাকে। সেই সঙ্গে ‘কাকতাড়ানি’, ‘খামার-চাঁচানি’, ‘দারোয়ানি’, ‘নিকোনি’, ‘পাহারাদারি’, ‘পার্বনি’, ‘সেলামি’, ‘কয়ালি’, ‘চোবানি’, ‘নজরানা’ প্রভৃতি বিভিন্ন বাড়তি খাজনার জুলুম কৃষকদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল।[১২] এই বাড়তি খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে কৃষকের জমি লাটদারদের দখলে চলে যেত এবং কৃষক পরিণত হত ভূমিহীন দিনমজুরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। দীর্ঘদিন ধরে হয়ে চলা এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর কাকদ্বীপের আন্দোলন নতুন মাত্রা

পেয়েছিল। যতীন মাইতি কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় কাকদ্বীপের কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে মুন্সেফ লাট, ফটিকপুর, বিশালাক্ষীপুর, দ্বারিকনগর, বেরারলাট, শিবরামপুর, রাধানগর, দুর্গানগর, চন্দনপিঁড়ি, লয়ালগঞ্জ, হরিপুর, বীজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে ধান তোলার মরশুমে কৃষক বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল। বল্লম, সড়কি, কাস্তে এবং লাল পতাকা নিয়ে কৃষকরা জমির ধান নিজেদের খামারে তুলতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর নিজেদের খামারে ধান তোলার অপরাধে জমিদার ও সরকারী পুলিশের যৌথ আক্রমণ আগের সমস্ত আক্রমণকে ছাড়িয়ে গেল। কেউ গ্রেফতার, কেউ নিহত, কেউ মারের ফলে মৃতপ্রায় হয়ে গেল।[১৩] তৎকালীন জমিদারী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির আলো দেখিয়েছিল লয়ালগঞ্জ নামক কাকদ্বীপের একটি গ্রাম। এই অঞ্চলের প্রতিরোধ অন্যমাত্রা পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১০ আগস্ট এখানকার কৃষকরা জমিদারদের কাছারি দখল করার সাথে সাথে পাঁচ হাজার বিঘা জমি দখল করে সেই জমি সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্বল্পস্থায়ী হলেও লয়ালগঞ্জ একটি জমিদারহীন স্বাধীন জনগণের শাসন পেয়েছিল।[১৪] সন্দেশখালির আন্দোলন একটু অন্যরকম ভাবে, অন্যরকম পন্থা অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল। এখানে কোনো চাষের জমির ধান কৃষকের খামারে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। এখানে আন্দোলনটা হয়েছিল জমিদারদের কাছারি বাড়ি ও শস্য মজুদের গোলাতে। ক্ষুধার্ত চাষিরা জমিদারদের গোলা আক্রমণ করে লুঠ করে সমস্ত কিছু নিয়ে পালায়। ১৯৪৭ সালের ১০ মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বারা জানা যায় যে, এই লুঠের পর পুলিশের অত্যাচারে আন্দোলনকারীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। সাত থেকে দশ জন চাষি

পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল এবং বহু মানুষ আহত হয়েছিল।[১৫] সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলন সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন কলকাতা শহরে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, এই দাঙ্গা সুন্দরবনে দেখা যায়নি। কৃষকদের ঐক্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সুন্দরবনে দানা বাঁধতে দেয়নি।

গোসাবাতে তেভাগা আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় একটু দেরিতে শুরু হয়েছিল, কারণ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের নেতৃত্বে গোসাবার উন্নয়ন গোসাবাকে অন্যান্য অঞ্চলের থেকে পৃথক করেছিল। কিন্তু ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের মৃত্যুর পর জেমস হ্যামিল্টনের সময় থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। প্রজাদের উপরে জমিদারের আমলা, গোমস্তাদের অত্যাচার এবং অন্যদিকে সুদখোর মহাজনদের শোষণের যাঁতাকলে চাষিদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এখানকার আদিবাসীদের অবস্থা সবথেকে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। শামুকই ছিল এদের ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র অবলম্বন। এই অবস্থায় মহাজনরা সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে এই সমস্ত দরিদ্র চাষিদের টাকা ঋণ দিত। মহাজনরা ভালো করেই জানত যে, এই সমস্ত খেতে না পাওয়া মানুষগুলো এই ঋণ শোধ করতে পারবে না। মহাজনদের লক্ষ্য ছিল এদের জমি, গোয়ালের গরু, থালা বাসনের উপর।[১৬] এই সংকটজনক পরিস্থিতে আরও বেশকিছু কারণে গোসাবার কৃষকরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রথমত, ১৯৪৪ সালে একটা ফরমান জারি করা হয়েছিল যে, হ্যামিল্টন এস্টেটের খালে আর সাধারণ মানুষ মাছ ধরতে পারবে না। কারণ ওই খাল এখন ইজারা দেওয়া হবে। ফলে এতদিন ধরে জনসাধারণ স্বাধীন ভাবে যে মাছ ধরত সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল।

প্রজারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ওজনে কারচুপির অভিযোগ ওঠে সমবায় রাইস মিলের বিরুদ্ধে। চাষিরা বাড়ি থেকে ধান মেপে নিয়ে আসতো বিক্রি করার জন্য, কিন্তু রাইস মিলে যখন মাপা হত তখন দেখা যেত প্রতি ১ মণ ধানে ২ কেজি করে ধান কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ বাড়ির ৪০ কেজি মাপা ধান রাইস মিলে ৩৮ কেজি হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবিচার সহ্য করার পর শেষ পর্যন্ত ওই দুর্নীতিগ্রস্ত মিল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চাষিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, চারিদিকে যখন তেভাগা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে তখন গোসাবার সাতজেলিয়া দ্বীপের জমিবন্টন ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিল যে, সরকারী খাস জমিতে কৃষকরা ধান চাষ করবে এবং বিনিময়ে তারা শুধুমাত্র ফসল চাষের খরচটাই পাবে। বাকি সমস্ত ফসল জমিদার নিয়ে নেবে। চাষিরা নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে যে ফসল উৎপাদন করত তার কোন কিছুই চাষিরা পেত না। তাই স্বাধীনতার পরেই গোসাবাতে কৃষির এই চুক্তিপত্র বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল।[১৭]

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাতেও এই আন্দোলনের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস সমস্ত কিছুতেই এই আন্দোলনের ছাপ পড়েছিল।[১৮] বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের প্রকাশ তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। তাই আলোচ্য প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের কিছু ছোটোগল্পের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের সাহিত্যিক প্রভাব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে সামাজের একেবারে নিচের তলার হতদরিদ্র, খেটে খাওয়া, শোষিত, লাঞ্ছিত, দিন

মজুরদের সংগ্রাম ছিল তেভাগা। ফলে তাদের মূল্যবোধের জন্ম, বিকাশ ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ফুটে উঠেছে সাহিত্যের মধ্যে। তেমনই মূল্যবোধ ও শ্রেণী সচেতনতামূলক দুটি গল্প হল- স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের **'মন্ত্রশক্তি'** ও মিহির আচার্যের **'দালাল'**। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের **'মন্ত্রশক্তি'** গল্পের মুখ্য চরিত্র গ্রামের ভূমিহীন সিঁধেল চোর রসুল তার চৌর্য বৃত্তি ত্যাগ করে কিভাবে একজন নিষ্ঠাবান তেভাগা আন্দোলনকারীতে পরিবর্তিত হয়ে উঠছে সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে। যে নিজের চৌর্য বৃত্তি ছাড়া কোনোদিন কোনো সভা, সমিতি বা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, অথচ সেই চোর যে নিজে একজন ভূমিহীন হয়েও কৃষকদের আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। লেখক এই গল্পের মধ্যে দিয়ে শ্রেণী চেতনা ও মূল্যবোধের একটি দারুণ আখ্যান তুলে ধরেছেন যে- শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভেবে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হবে না। ব্যক্তিস্বার্থের আগে সমাজের মানুষের মঙ্গল কামনা বাঞ্ছনীয়। তাই সমাজের স্বার্থে একটা চোরও তার নিজের কাজ ছেড়ে একটা নতুন মানুষে পরিণত হতে পারে এবং সমাজের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।[১৯]

মিহির আচার্যের **'দালাল'** (১৯৫০) গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। গল্পের মূখ্য চরিত্র দীপচাঁদ। দীপচাঁদ পেশায় একজন চাষি হলেও ধীরে ধীরে সে ব্রিটিশ সরকারের দালাল বা গুপ্তচরে পরিণত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের শুরু থেকে দীপচাঁদের শুধুমাত্র একটি কাজ ছিল আন্দোলনকারীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীপচাঁদের কৃষক বৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনকারীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এমন ভাবে লেখক শ্রেণী ঐক্য এবং সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছিলেন।[২০] ননী ভৌমিকের তেভাগা আন্দোলনের

অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্পসংকলন ‘ধানকানা’(১৯৫৩)। এই গল্প সংকলনের প্রতিটা গল্পে লেখক ভূমিহীন চাষিদের দুর্গতির মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। দুর্দশাগ্রস্ত চাষিদের উপরে মহাজন, জমিদার, দারোগা ও পুলিশের অমানবিক বাস্তব রূপ বার বার এই গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

সৌরি ঘটকের **‘কমরেড’** (১৯৬০) এবং **‘অরণ্যের স্বপ্ন’** (১৯৬১) গল্পের মধ্যে দিয়ে তেভাগা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ও নারী সমাজের চেতনার বিকাশকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নারী পুরুষ উভয় পক্ষের মেলবন্ধনে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **‘বন্দুক’** (১৯৪৩) গল্পের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের মূল্যবোধ তথা সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণী-ঐক্য তুলে ধরেছেন। গল্পে তেভাগা আন্দোলনের নেতা রহমানকে হত্যার জন্য জোতদাররা রঘুরাম নামের একজন ভাড়াটে খুনিকে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু সেই খুনি শেষ পর্যন্ত ওই কৃষক নেতাকে খুন না করে বন্দুক সহকারে পালাতে সাহায্য করে। কারণ ওই খুনিও একদিন কৃষক ছিল, হতে পারে সে এখন ভূমিহীন, কিন্তু কৃষক সমাজের প্রতি রঘুরামের যে মূল্যবোধ ও শ্রেণী ঐক্য সেটাকে উপেক্ষা করে সে এই খুন করতে পারেনি। এভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের বাস্তবিক রূপ প্রকাশ পেয়েছিল।[২২] এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হারানের নাতজামাই’ (১৯৪৬), ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ (১৯৪৬), ‘চৈতালী আশা’ (১৯৪৭), ননী ভৌমিকের ‘সলিমের মা’ (১৯৪৬), ‘ধানকানা’ (১৯৪৭), ‘আগন্তুক’ (১৯৫৮ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর ‘প্রতিরোধ’ (১৯৩৮) ইত্যাদি গল্পের মধ্যে দিয়েও তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসের ধারা প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং সুন্দরবনের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ আবদানকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। বাংলা সাহিত্যে সুন্দরবনের সমাজ, রাজনীতি,

অর্থনীতি, জনজীবন ও সংস্কৃতির গভীর প্রভাব পড়েছিল। সুতরাং যদি আমরা বলি সুন্দরবনের ইতিহাসের সম্পূর্ণতা প্রদান বাংলা সাহিত্য ছাড়া সম্ভব নয়, তাহলে এটা অত্যুক্তি হবে না। প্রতিটি সভ্যতার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবদান চরম সত্যে পরিণত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সুন্দরবনও ব্যতিক্রম নয়। এরপর ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনও ছিল সুন্দরবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এই আন্দোলনের পটভূমি হিসাবে বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই আইনের ফলে জমি জমিদারদের থেকে কৃষকদের কাছে আসার পরিবর্তে বিপুল ক্ষতিপূরণসহ সমস্ত জমি জমিদারদের দখলেই থেকে গিয়েছিল, যার ফলে কৃষকদের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে গিয়েছিল। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্যের দাবীতে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ কৃষক সকলে মিলিতভাবে খাদ্যের দাবীতে, কেরোসিনের দাবীতে, মজুতদার, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল। তাই শুধুমাত্র তেভাগার দাবীতেই নয়, সুন্দরবন সবসময় সমগ্র দেশের রাজনীতির মূল স্রোতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে এবং আন্দোলন, সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনও করেছে। স্বাধীনতার পরেই তেভাগা ও খাদ্য আন্দোলন সুন্দরবনের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করলেও এই আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থপূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, চাষিদের আত্মসম্মানের মর্যাদাকেও প্রতিষ্ঠা করার লড়াই ছিল।

উদ্বাস্তু সমস্যা ও মরিচঝাঁপি

সুন্দরবনের উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিহাসে মরিচঝাঁপির ঘটনা একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। উদ্বাস্তুদের সাথে ঘটে চলা বেদনাদায়ক ইতিহাসের প্রতিচ্ছ। বিসুন্দরবনের কুমিরমারী দ্বীপের দক্ষিণে মরিচঝাঁপি দ্বীপের অবস্থান। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি থেকে ২৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই দ্বীপটিকে অবরোধ (ব্লকেড) করে, যাতে মরিচঝাঁপির মানুষ খাদ্য ও জল না পেয়ে মারা যায় এবং অনাহারক্লিষ্ট মানুষেরা বেঁচে থাকার আশায় এই অঞ্চল ছেড়ে পুনরায় দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায়।[২৩] সরকার কেন এই দ্বীপটিকে সবদিক থেকে অবরুদ্ধ করেছিল এবং কেন উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবে সে বিষয়ে আলোচনা যুক্তিযুক্ত। ঘটনার সূত্রপাত ষাটের দশক থেকে, যখন পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু হিন্দুরা সাম্প্রয়ায়িক উস্কানিমূলক দাঙ্গা থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে শেষ অবলম্বন হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ওই সময় পুনরায় দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ১১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সাব কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, দন্ডকারণ্য অঞ্চলের উন্নয়ন করে সেখানে ধীরে ধীরে ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং ২০ লক্ষ আদিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।[২৪] এমনিতেই স্বাধীনতার পর থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল, সেই জন্য পুনরায় এই সমস্ত শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ কিংবা সুন্দরবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে দণ্ডকারণ্যতে পাঠানো হয়েছিল। ১৫-২০ বছর দণ্ডকারণ্যে থাকার পরেও ভাষাগত সমস্যা, জলের অভাব, খাদ্যের অভাব, জীবিকা নির্বাহের অসুবিধা, রোগ, অকালে মৃত্যু

প্রভৃতি কারণে দণ্ডকারণ্যের প্রায় লক্ষাধিক উদ্বাস্তু ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল।[২৫] ২৬শে জুন ১৯৭৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকারী শরণার্থীদের শ্লোগান ছাপা হয়েছিল- "চল কলকাতা, চল সুন্দরবন"।[২৬] সেই সাথে তারা আরও বলেছিল যে, "এখন নেতারা বললেও শুনবো না। সুন্দরবন তথা পশ্চিমবঙ্গে আমরা যাবোই। এখানে সি.আর.পি-র হাতে লাঞ্ছিত হওয়া ও মরার থেকে সুন্দরবনের বাঘের পেটে যাওয়া অনেক শান্তির"।[২৭] এইভাবে বহু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাস থেকে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের হাসনাবাদ, কুমীরমারি, মরিচঝাঁপি এলাকায় ঢুকতে শুরু করেছিল। আগত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতে কোনো সংঘর্ষ না হয় এবং উদ্বাস্তুরা যাতে স্থানীয়দের জমি দখল করতে না পারে সেই জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারী তথ্য অনুযায়ী হাসনাবাদে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল- ১১,১০৬ জন; চর হাসনাবাদে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল- ১৬,৯২৯ জন; কুমীরমারি ও বাগনায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল- ৫ হাজার।[২৮] সরকার এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের ত্রাণের কোনো ব্যবস্থা না করে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রাণের ব্যবস্থা করছিল তাদেরকেও কাজ করতে বাধা দিয়েছিল। জেলাশাসক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলন যে, তারা কোনো ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না; কিন্তু জলনিকাশি ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।[২৯]

মরিচঝাঁপিতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল চাষি, কামার, কুমোর, জেলে, দিনমজুর যারা প্রথাগত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ব্যবহারিক গুণে ও জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে অনেকটাই স্বনির্ভর ছিল। তাই সরকারের থেকে কোনও রকমের সাহায্যের আশা না রেখে তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে মরিচঝাঁপিকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার

কাজে হাত লাগিয়েছিল। প্রথমে তাঁরা জঙ্গল পরিষ্কার করেছিল এবং তারপর নদীর জল আটকানোর জন্য দ্বীপটির চারিধারে উঁচু বাঁধ দিয়েছিল। খড়, হোগলা, মাটির বেড়া প্রভৃতি ব্যবহার করে কিছু বাড়ি নির্মাণ করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে রাস্তা নির্মাণ, বাজার স্থাপন, পুকুর খনন, বিড়ি তৈরির কারখানা, রুটি তৈরির কারখানা, নৌকা তৈরির কারখানা, শিশুদের পড়াশোনার জন্য পাঠশালা নির্মাণ, মাছ চাষের ভেড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে গ্রামটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বনির্ভর গ্রামে পরিণত করেছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নেতাজিনগর'।[৩০] কিন্তু এই স্বনির্ভরতার দাবীটিকে মানতে রাজি হয়নি তৎকালীন রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব অমিয় সেন বলেছেন যে, এই দাবীগুলো অসত্য ও অতিরঞ্জিত। রাজ্য সরকার এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে সরকারি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ জানিয়েছিল। বেআইনি ভাবে গাছ কেটে বিক্রি করা, ব্যাঘ্র প্রকল্পের ব্যাঘাত ঘটানো, বাংলাদেশের সাথে চোরাচালান, সরকারি আইন অমান্য ইত্যাদি কারণে সরকার মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[৩১] সরকারের উদ্বাস্তুদের উপরের চাপিয়ে দেওয়া এই যুক্তি ও দাবীগুলো ছিল শুধুমাত্র মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষগুলোর উপর সরকারি কঠোর ও নিন্দনীয় কাজকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। মরিচঝাঁপিতে যে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিল এবং সরকারি সহায়তা ছাড়াই যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তোলার চেষ্টা করেছিল, তাদেরকে ওই এলাকা থেকে উৎখাত করার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলাম। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উৎখাতের কাহিনী ও ইতিহাস কমবেশি সকলের জানা তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আসলে উদ্বাস্তুরা একটা নীতিহীন রাজনীতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করত। উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের

বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পথে বামপন্থীরাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অথচ ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তাদের কথামত যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে চলে এসেছিল তাদেরকে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার সেখান থেকে উচ্ছেদ করেছিল। সরকার ২৪শে জানুয়ারি দ্বীপটিকে অবরোধ করার পর ৩১শে জানুয়ারি প্রথম পুলিশ দ্বারা অসহায় মানুষগুলোর উপরে গুলি চালানো হয়েছিল এবং সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান বন্ধ করে দিয়েছিল। হাইকোর্ট ৯ ফেব্রুয়ারি রায় দিয়ে জানিয়েছিল যে, জল-অন্ন আনার উপর কোনও ধরণের বাধা নিষেধ থাকবে না। কিন্তু কোর্টের ওই রায়কে মানা হয়নি এবং বাধা নিষেধ আরও তীব্র করা হয়েছিল।[৩২] রাজ্য সরকারের ১৩, ১৪ ও ১৫ মে ১৯৭৯ 'অপারেশন মরিচঝাঁপি' দ্বারা সমস্ত উদ্বাস্তুকে ওই এলাকা থেকে উৎখাত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং ১৭মে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে সাংবাদিকদের জানালেন 'মরিচঝাঁপি শরণার্থী শূন্য'।[৩৩] দীর্ঘদিন ধরে দণ্ডকারণ্যের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও ওই প্রকল্পের ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সরকারি ভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বাঙালি উদ্বাস্তুরা সেখানে যাতে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার না পায়, একটু খেয়ে পরে সম্মানের সাথে জীবনধারণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়নি। যদি এই সামান্য দাবীটুকু পূরণ করা হত তাহলে হয়ত এত বড় নিষ্ঠুর ঘটনাকে এড়ানো সম্ভব হত। আরও একটা প্রশ্ন হল যে, যারা দণ্ডকারণ্য থেকে এসে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে ওইভাবে নিষ্ঠুরতার সাথে গায়ের জোরে উৎখাত করার কি খুবই প্রয়োজন ছিল? ওই কয়েক হাজার লোকের অন্নসংস্থান ও থাকার ব্যবস্থা কি পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব ছিল না? যখন তাদের দাবী শুধুমাত্র একটু থাকার জায়গার আর কোনও কিছু নয়, তখনও আর্থিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে মূল্যহীন ওই জনবসতিহীন

মরিচঝাঁপি দ্বীপটা উদ্বাস্তুদের হাত থেকে মুক্ত করাটা সত্যিই কি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? মরিচঝাঁপির ঘটনাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে উদ্বাস্তু সমস্যাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো এমন নয় যে, সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সরকার পুনর্বাসন ও উন্নয়নের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যেমন- ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা কলোনি গুলোর উন্নয়নে সরকারী ভাবে অর্থ মঞ্জুর, ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ১০২ টি জি.এস কলোনি এবং ৯টি জবরদখল করা কলোনির উন্নয়ন, ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫২.৪৩ কোটি টাকা খরচ করে ১,৭০,২৬৯ টি প্লটের উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের দ্বারা উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা, কৃষির কাজে সাহায্য করার জন্য কৃষি দ্রব্য প্রদান ইত্যাদি।[৩৪] এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনেক কম অনুদান পেয়েছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মত উপকূলবর্তী রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি। ফলে সৃষ্টি হওয়া এই উদ্বাস্তু সমস্যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। যদিও বাস্তুতন্ত্র বলতে জীবকূল ও পরিবেশকেই বোঝায়, কিন্তু সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল এমন একটি দর্শন যেখানে মানুষ এবং মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কিত পরিবেশের কথা উঠে আসে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, এই দর্শন আমাদের এই পৃথিবীকে সচেতন করে তুলতে ও তার নিজস্ব প্রতিফলন ঘটিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের কথা বলে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল একটি সুসংগত পরিকাঠামো যা বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ বিরোধী প্রবণতার তীব্র সমালোচক। তাই মরিচঝাঁপির উদ্ভূত সংকট সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সুন্দরবনের উন্নয়ন ও প্রগতিশীলতায় সরকারের ভূমিকা

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে সুন্দরবন ছিল অন্যতম। উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যাভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে সুন্দরবনবাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই সুন্দরবনের অবস্থার উন্নয়নে সরকারি কাজের ধারাবাহিকতা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে, রাজ্য সরকার সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৬৬ সালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন (CMPO) এর অধীনে 'সুন্দরবন প্ল্যানিং টিম' গঠন করে কাজ শুরু করেছিল। এরপর ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুন্দরবন পরিদর্শনে আসার পর, তার কাছে সুন্দরবনের উন্নয়নের বিষয়ে দাবী জানানো হলে ১৯৭৩ সালের ১লা মার্চ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছিল। উন্নয়ন পর্ষদ গঠন হওয়ার পর সুন্দরবনের উন্নয়নের প্রগতিশীলতায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ওঠার আগে ১৯৭২ সালে বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হওয়া ছাড়া সেইঅর্থে সুন্দরবনের তেমন কোন উন্নয়নের কাজ শুরু হয়নি। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ওঠার পর থেকে সুন্দরবনের ইতিহাসে নানা ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছিল। একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৩ সালেই ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যাঘ্র প্রকল্প। ১৯৭৬ সালে পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত ভগবতপুর মৌজায় সপ্তমুখি নদীর ধারে কুমীর প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। ওই বছর আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছিল। সন্দেশখালীতে ৩৬২ বর্গ

কিলোমিটার, লেথিয়ান দ্বীপে ৩৮ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপে ৬ বর্গ কিলোমিটার এবং মাতলা নদীর পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের ৫৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর বা মূল এলাকার ১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার 'জাতীয় উদ্যান' হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবনের সম্মানে নতুন পালকের সংযোগ হয়েছিল। অর্থাৎ ওই দিনে আন্তর্জাতিক সংস্থা UNESCO সুন্দরবনের জাতীয় উদ্যানকে 'বিশ্বের ঐতিহ্যশালী স্থান' (World Heritage Site) হিসাবে ঘোষণা করে। সুন্দরবনের জাতীয় উদ্যান বলতে সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের মূল কেন্দ্রকে বলা হয়। ১৯৮৯ সালের ২৯শে মার্চ সমগ্র সুন্দরবনকে অর্থাৎ ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।[৩৫] উপরিউক্ত প্রকল্পগুলো সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের কাঠামোকে উন্নত করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে এই প্রকল্পগুলো সুন্দরবন উন্নয়ন ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছিল। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বর্ষে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের বাজেট হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। ১৯ টি ব্লকের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ তুলনামূলক ভাবে অনেক কম ছিল। এরপর ১৯৯৪ সালে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর গঠিত হওয়ার পর সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ আরও সুগঠিত হয়েছিল। এই দুটি দপ্তর যৌথভাবে সুন্দরবনের উন্নয়নে গতি এনেছিল। সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এবং সুন্দরবন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে।[৩৬] চারটি কর্ম রূপায়ণ বিভাগের দ্বারা পর্ষদের কাজ পরিচালিত হয়। বিভাগ গুলি হলো- ১. কৃষি বিভাগ, ২. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ৩. সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, ৪. মৎস্যপালন বিভাগ। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবনের

উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মধ্যে ইটের রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা শুরু করছিল, সেই সঙ্গে জেটিঘাট না থাকার ফলে জল পরিবহনে মালপত্র ওঠানো-নামানো ও মানুষের যাওয়া আসার অসুবিধার কথা চিন্তা করে জেটি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করেছিল।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবনের উন্নয়নের ইতিহাসে সরকারি প্রতিরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারী সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পর্ষদের দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু করেছিল। পর্ষদ বেশকিছু বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যেমন- সুন্দরবনবাসীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। যোগাযোগ ও পরিবহণ, জলসম্পদ, সেচ ও নিকাশির উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছিল। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বৈদ্যুতিক শক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছিল। স্পর্শকাতর এই জীব পরিমণ্ডলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ছিল। আর্থ-সামাজিক এবং সহযোগী কর্ম পরিকল্পনা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং গ্রামীণ কারিগরির মাধ্যমে জীবনধারণের মানোন্নয়ন ঘটানোর সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত আইন পাশ করেছিল এবং এই আইনের দ্বারা ১৯৭৭ সালের নির্বাচন পরিচালিত হয়েছিল ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।[৩৭] বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সবার আগে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটায়। পূর্ববর্তী জাতীয় কংগ্রেসের সরকার ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ বিল পাশ করেছিল, কিন্তু সেটাকে আইনে পরিণত করেনি। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৮ সাল থেকে সুন্দরবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিল, কারণ এই সময় থেকে সাধারণ মানুষের বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে তাদের মনে সরকারি এই

সিদ্ধান্তের কোনো বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে সেটা সুনিশ্চিত করা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথমত, স্থানীয় মানুষের জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বনাঞ্চলের বাইরে সীমান্তবর্তী এলাকাতে জ্বালানী কাঠের বনাঞ্চল তৈরি করা, দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের জন্য পুকুর খননের ব্যবস্থা করে মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়া, তৃতীয়ত, গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা ও মিষ্টি জলের পুকুর খনন করে পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা, চতুর্থত, জ্বালানী কাঠের বিকল্প হিসাবে সোলার কুকার সরবরাহ করা, পঞ্চমত, জীবিকার সন্ধানে জঙ্গলে যাওয়া মানুষদের জন্য জীবনবীমার সুবিধা বাড়ানো ইত্যাদি। এছাড়া কাঁকড়া, ঝিনুক, মাশরুম সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটানো হয়েছিল।[৩৮] ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে মাতলা নদীর চরে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বীজবপন সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়ে ৫৫৫০ টি সরকার অনুমোদিত মাছ ধরার বোটের কথা জানা গিয়েছিল। এই সময় মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল ১৯৮৮-৮৯ তে ২৫,৩০০ জন, ১৯৮৯-৯০ তে ২৫,৫৫০ জন, ১৯৯০-৯১ তে ২৬,৪০০ জন।[৩৯] এই ভাবে প্রগতিশীলতার ধারাতে সুন্দরবনের উন্নয়নের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের কার্যকারিতা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে আলোচ্য অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে, রাজনীতি সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাঠামোকে প্রভাবিত করে সেটা গবেষণা পত্রের ভূমিকাতে আলোচনা করেছি, তাই এখানে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাঠামোতে

বারবার পরিবর্তন এসেছিল। প্রথম পরিবর্তন আসে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাজনের সাথে, দ্বিতীয় পরিবর্তন আসে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা লাভের সাথে, তৃতীয় পরিবর্তন আসে ১৯৮৬ সালে চব্বিশ পরগণার বিভাজনের সাথে এবং চতুর্থ পরিবর্তন আসে ২০১১ সালে তৃণমূল সরকারের ক্ষমতা লাভের মধ্যে দিয়ে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাযে অব্যাহত সেটা সম্প্রতি সুন্দরবনকে পৃথক জেলা হিসাবে ঘোষণার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেল। এছাড়া সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দর্শনগত দিক পর্যালোচনা করে একটি বিষয় প্রমাণিত যে, সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আইন, প্রতিষ্ঠান সবারই নিবিড় যোগাযোগ বর্তমান। তাই আমরা বলতে পারি রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে বাস্তুতান্ত্রিক পরিকাঠামোর প্রভাবিত হওয়াটা সর্বত ভাবে সত্য। তাই রাজনীতি যে সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটাও প্রমাণিত।

তথ্যসূত্রঃ

১. সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫০-২০১১ (কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ- ১৩

২. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জনজীবনের কথা (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ- ২৫-২৬

৩. সন্দীপ দত্ত, লিটিল ম্যাগাজিনে দেশভাগ (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮), পৃ- ১৪০

৪. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জনজীবনের কথা (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ-২৭

৫. সন্দীপ দত্ত, লিটিল ম্যাগাজিনে দেশভাগ (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮), পৃ- ১৪০

৬. তদেব, পৃ- ১৪৭

৭. Anindita Ghoshal, Refugees, Boarder and Identities: Rights and Habitat in East Northeast India (South Asia Edition: Routledge, 2021) p. 86-87

৮. সুব্রত রায়চৌধুরী, দেশভাগ স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ (কলকাতা: তথ্যসূত্র, ২০২০), পৃ-৬৪

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই মার্চ, ১৯৪৮, পৃ-৩

১০. Census of India 1951, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas, p- 295

১১. Joya Chatterjee, The spoils of partition: Bengal and India 1947-1967 (New Delhi: Cambridge University Press, 2007), p- 112

১২. গোকুল চন্দ্র দাস, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪), পৃ- ৮৯

১৩. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতা: ছোঁয়া, ২০২০), পৃ- ২১৬

১৪. তদেব,

১৫. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ, ১৯৪৭, পৃ- ৪

১৬. চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন গোসাবা এজেন্টঃ কৃষক আন্দোলনের তথ্যানুসন্ধান (দক্ষিণ ২৪ পরগণা: ডিজিটাল ক্যানভাস, ২০১৮), পৃ- ৭৭

১৭. তদেব, পৃ- ৫৫

১৮. সুস্নাত দাশ, "বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-আন্দোলন", International journal of Bengal Studies, Vol. 2-3, 2011-2012, p.100

১৯. Ghanashyam Roy, "সাহিত্যের দিক্ বিচ্ছুরণঃ তেভাগার আলোর ছটায় ছোটগল্প", Ensemble, A bi-lingual peer reviewed academic journal, Vol.1, No.2, September 2019

২০. সুস্নাত দাশ, "বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-আন্দোলন", International journal of Bengal Studies, Vol. 2-3, 2011-2012, p. 105

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ১০৭

২২. রসুল আবদুল্লাহ, কৃষক সভার ইতিহাস, (কলকাতা: নবজাতক, ১৯৭৮), পৃ- ৭৯

২৩. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি নি:শব্দের অন্তরালে (কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০২, পৃ- ৬৭

২৪. জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃকারা এবং কেন?, (কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫), পৃ- ৮

২৫. যুগান্তর, ১৬ই মে, ১৯৬৪, পৃ- ৩

২৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন, ১৯৭৫, পৃ- ১

২৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জুন, ১৯৭৫, পৃ- ২

২৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮, পৃ- ৪

২৯. দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা, ৩১ মার্চ, ১৯৭৮, পৃ- ৩

৩০. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মরিচঝাঁপি : দণ্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবন (কলকাতা: ঋতাক্ষর, ২০১০), পৃ- ২১

৩১. যুগান্তর, ২১ জুন, ১৯৭৮, পৃ- ২

৩২. কালান্তর, ২৬ ফেব্রয়ারি, ১৯৭৯, পৃ- ১

৩৩. আনন্দবাজার, ২০ মে, ১৯৭৯, পৃ- ৪

৩৪. Government of West Bengal Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol. 1, 2001

৩৫. সুন্দরবন দিবস ২০১৪, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৬. রিপোর্ট, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৪

৩৭. Administration and Organization for Rural Development in Sundarbans, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal.

৩৮. Barun De, West Bengal District Gazetteers, South 24 parganas, March 1994, government of west Bengal.

৩৯. তদেব,

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহ্যের রক্ষাকল্পে সুন্দরবনের বনসম্পদ ও সামাজিক বাস্তুতন্ত্র

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা অমূল্য সম্পদ হল বনসম্পদ। অরণ্যে বসবাস করা মানুষ যখন পাথরে পাথরে ঘষে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল, মানব সভ্যতার সেই ঊষালগ্ন থেকে বনসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের ইতিহাসে বনসম্পদের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই অঞ্চলের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ। বন সম্পদের দুটি দিকের গুরুত্ব সবথেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ক) অর্থনৈতিক গুরুত্ব খ) পরিবেশগত গুরুত্ব। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথমপর্বে সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় বনসম্পদের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বন সম্পদের দ্বারা সুন্দরবনবাসী কেমন ভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হয়ে চলেছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় বনসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সুন্দরবনের ধারাবাহিকতায় বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ঘরবাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে যানবাহন তৈরিতে বনসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ধরা দিয়েছে। এটি একটি নদীকেন্দ্রিক ভূখণ্ড, সুন্দরবনকে শিরা উপশিরার মত চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে নদী। নদী ছাড়া সুন্দরবনের কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমাদের একটি

ধারণা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত যে, সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া সুন্দরবনবাসীর অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়বে। আমরা এককথায় বলতে পারি সুন্দরবনের পরিবহণের প্রধান মাধ্যম নদী। নদী পথের সাহায্যে সুন্দরবনবাসী তাদের জীবন তথা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমপর্বে বনসম্পদ দিয়ে তৈরি সালতি ও নৌকা ছিল সুন্দরবনবাসীর কাছে নদীকেন্দ্রিক পরিবহণের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম।[১] মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং নদী ও জঙ্গল থেকে মাছ, কাঁকড়া, কাঠ, মধু, সংগ্রহ করার সাথে যারা যুক্ত আছে, তাদের এই কাজের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। যদি নৌকা নামক বস্তুটির আবিষ্কার না হত, তাহলে সুন্দরবনের বিকাশ বা উন্নয়নের অগ্রগতি সম্ভব হত না। তাই আমরা বলতে পারি সুন্দরবনের উন্নয়নের সাথে নদীকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার একটি গভীর যোগাযোগ আছে।[২] স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সুন্দরবনের পরিবহণের বিষয়ে তেমন কোনো লিখিত তথ্য না পাওয়ার ফলে বর্তমানের ক্ষেত্রসমীক্ষা এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলি হল- সালতি, নৌকা, ভটভটি, লঞ্চ, স্টিমার, বজরা, পানসি ইত্যাদি। এই জলযানের দ্বারা এই দ্বীপগুলো একে অপরের সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত জলযান বনসম্পদ বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। তাই সুন্দরবনের উন্নয়ন ও আমাদের নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র তৈরিতে বনসম্পদের ভূমিকা সবথেকে বেশি।

ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি থাকায় জ্বালানি হিসাবে কাঠের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের তথা সুন্দরবনের জ্বালানি শক্তির সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করছে সুন্দরবনের বনসম্পদে ভরা ম্যানগ্রোভ অরণ্য। সুন্দরবনের কেওড়া, বাইন, গরান, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট

মানের জ্বলানি কাঠ। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে লক্ষ লক্ষ কুইন্ট্যাল জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হয়। সুন্দরবন সংলগ্ন স্থানীয় বাজারগুলোতে (গোসাবা, সাতজেলিয়া, আমলামেথি, কুমিরমারি, মোল্লাখালী, নামখানা, কাকদ্বীপ) ঐ জ্বালানি কাঠ বিক্রি করে দেওয়া হয়। জ্বালানি কাঠ হিসাবে গরান কাঠের আলাদাই সবথেকে বেশি। মানে এবং গুণে গরান কাঠ সবার উপরে। তাই সুন্দরবন থেকে জ্বালানি হিসাবে গরান কাঠ সবথেকে বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়।[৩] জ্বালানী সংগ্রহ ছাড়াও গোলপাতা সংগ্রহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। গোলপাতা সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বনসম্পদ। বিনা অনুমতিতে গোলপাতা সংগ্রহ আইনত অপরাধ। বনবিভাগ থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার পরেই গোলপাতা সংগ্রহ করা সম্ভব। গোলপাতা সংগ্রহের সাথে যারা যুক্ত তাদের আঞ্চলিক ভাষাই 'বাওয়ালী' বলা হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ গোলপাতা সংগ্রহের আদর্শ সময়। কারণ এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত গোল গাছে ফল আসে এবং ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে ঐ ফল পেকে যায়। মাটি থেকে ৯ ইঞ্চি উপরের গোলপাতা কাটতে হয়। অন্যথায় বাওয়ালীদের জরিমানা দিতে হয়। সুন্দরবনের উপকূলবর্তী মানুষের ঘরের ছাউনি ও বেড়া এই গোলপাতা দিয়ে তৈরি করা হত। প্রচলিত কথা অনুযায়ী গোলপাতাকে গরিবের আশ্রয়স্থলের প্রধান উপাদান হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৪] এছাড়া বাঘের প্রধান আশ্রয়স্থল হল গোলপাতা।

মানব সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে মানুষের রোগ নিরাময়ে ভেষজ ঔষধের ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক চিকিৎসার যথেষ্ট প্রসার ঘটলেও ভেষজ ঔষধের গ্রহণযোগ্যতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনের গভীরে জন্ম নেওয়া লতা, পাতা, গুল্ম, বৃক্ষ, ভেষজ ঔষধের মহামূল্যবান উৎস হিসাবে বিবেচিত। সুন্দরবনে প্রায়

৩৩৪ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়।[৫] ভেষজ ঔষধের জনপ্রিয়তা তুলনামূলক ভাবে শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামাঞ্চলে বেশি। বন সংলগ্ন এলাকাতে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের চিকিৎসার প্রধান উপকরণ ছিল এই ভেষজ বনজ উদ্ভিদ ও লতাপাতা। সুন্দরবনের অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে অর্জুন, আমলকী, হরিতকি, বহেড়া, নিম, বাসক, কালমেঘ, তুলসি, ধুতরা, আকন্দ, থানকুনি, পিতরাজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন হৃদরোগ চিকিৎসায়; আমলকী, হরিতকি, বহেড়া পেটের ব্যাথায়, কোষ্টকাঠিন্য, বদহজম, আমাশয়, চর্মরোগের চিকিৎসায়; বাসক-তুলসি সর্দি, কাশি, হাঁপানির চিকিৎসায়; নিম পাতা চর্মরোগ ও ক্রিমিনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৬] সুন্দরবনে ভেষজ বা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ওঝা, গুণিনদের মধ্যে। এই কাজে তাদের সফলতার প্রধান সহায়ক হল এই ভেষজ উদ্ভিদ। শুধুমাত্র ভেষজ ঔষধের দ্বারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তেমন ভাবে সম্ভব নয়, এই কারণে তারা সাধারণ মানুষের মনে খুব সহজে বিশ্বাস আনার জন্য কিছু মন্ত্র, দেবদেবীর স্তব, পূজা, হোম ইত্যাদি জুড়ে দিয়েছিলেন। তাদের এই চিকিৎসা বা রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ন ভেষজ উপায়ে।[৭] এই ওঝা, গুণিনদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন ভাবে না থাকলেও তারা মৌখিক অভিজ্ঞতা ও পরম্পরা থেকে শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ভেষজ বিদ্যা খুব ভালো ভাবেই আয়ত্ত করেছিল, ফলে এই সমস্ত গুণিন ওঝারা গাছ- গাছড়া খুব ভালো করে চিনতে পারত এবং কোন গাছ-গাছড়া থেকে কি রোগ ভালো হবে এবং কি ভাবে ঔষধ তৈরি করতে হবে সেটা খুব ভালো করে জানত।[৮] শুধুমাত্র অশিক্ষা বা কুসংস্কারের আবর্তে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

অন্যান্য বনসম্পদের মধ্যে মোম ও মধু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের মধু বিশ্ববিখ্যাত। যে সমস্ত দ্বীপে এখনও পর্যন্ত জনবসতি গড়ে ওঠেনি সেই দ্বীপগুলোতে মৌমাছির বাসস্থান। এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহের সময়। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মোম ও মধু সংগ্রহের সাথে হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। সুন্দরবনের যে সমস্ত গাছে মধু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় বা যে গাছগুলোকে মধুবৃক্ষ বলে উল্লেখ করা হয় সেগুলি হল- খলসী, গেঁওয়া, বাইন, কেওড়া, ওড়া, গরান প্রভৃতি। এই গাছগুলোর মধ্যে খলসী গাছের মধু স্বাদে, গন্ধে সবার থেকে সেরা।[৯] মধু সংগ্রহের সাথে যারা যুক্ত তাদের মৌলে বলা হয়। এই মৌলে কোন জাতি, ধর্মের নাম নয়। মৌলেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নিম্নমানের। অধিকাংশের নিজস্ব জমি নেই। বছরের অর্ধেক সময় তাদের অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়। তাই মধু সংগ্রহের এই তিন মাস মৌলেরা বেশি অর্থ উপাজনের আশায় নিজেদের জীবনকে বাজি রাখতেও পিছুপা হয়না।[১০] কাঠ, ভেষজ সম্পদ, মোম ও মধু ছাড়াও সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করেছি।

সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় ম্যানগ্রোভ বনসম্পদের পরিবেশগত গুরুত্ব

সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়ার জন্য বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থান ঐ অঞ্চলের বনাঞ্চলের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাই সুন্দরবনের আবহাওয়ার উন্নয়ন ও অবনয়নে ঐ অঞ্চলের বনাঞ্চলের অবদান সবথেকে বেশি। বনের গাছপালা বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। সেই কারণে যে সমস্ত এলাকাতে গাছের সংখ্যা কম সেখানে বৃষ্টিপাত কম হওয়ার

সাথে সাথে ঐ এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলে। সুন্দরবনের প্রাত্যহিক জীবনে বনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত দিক হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। সুন্দরবন একটি বিপদসঙ্কুল এলাকা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সুন্দরবনে প্রায় বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে। এই বিপর্যয় সমগ্র সুন্দরবনকে সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিলেও এই সঙ্কটের সময় ঢাল হয়ে দাঁড়ায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, নদীবাঁধের ধস ইত্যাদি বিপর্যয়কে প্রাথমিক ভাবে প্রতিহত করে এই বনাঞ্চল। এই বিপর্যয়গুলো সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে উপকূলের মানুষ তথা সুন্দরবনবাসীর উপরে আছড়ে পড়তে পারে না। তাই সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে অনেক কমে হয় এবং উপকূলীয় জনসমাজ বড় ধরণের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৮৮ সালের প্রতি ঘণ্টায় ২৭৫ কি.মি. বেগে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সুন্দরবনের সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। অনেক মানুষ ও প্রাণী মারা গিয়েছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পূর্বের সমস্ত বিপর্যয়কে হার মানিয়ে দিয়েছিল। এই বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নজিরবিহীন, যা আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারতো, কিন্তু সেটা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের জন্য সম্ভবপর হয়নি। ব্রিটিশ আমল থেকেই সুন্দরবনের ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ সমস্ত বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে চলেছে অতন্দ্র প্রহরীর মত। অথচ এই নদী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ সময় মত সঠিক ভাবে করা সম্ভব হয়না। এই বাঁধের সমস্যা সুন্দরবনের জন্মলগ্ন থেকে। এই ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধকে প্রাকৃতিক উপায়ে রক্ষা করতে পারে একমাত্র এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।[১১] সুন্দরবনের নদীগুলো খুবই স্রোতপ্রবণ, ফলে নদীর স্রোতে বাঁধের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি হয় এবং ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়। এই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের

শিকড় শক্ত করে মাটিকে ধরে থাকে ফলে সেই ভূমিক্ষয় অনেক পরিমাণে কমে যায়। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সুন্দরবনে ভ্রমণ বা পর্যটনশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত নদীনালায় ঘেরা পৃথিবীর সবথেকে বৃহৎ ব-দ্বীপ এই সুন্দরবন। সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পর্যটকের আগমন ঘটছে, যা পর্যটনশিল্পের সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীর জীবনেও প্রভাব ফেলছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় যে, ২০১০ সালে ৮৯ হাজার ৪১৭ জন, ২০১১ সালে ৯৪ হাজার ৫৮২ জন, ২০১২ সালে ৯৭ হাজার ৪১৭ জন পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিল।[১২] সুন্দরবনের প্রতি মানুষের যে একটা আগ্রহ বাড়ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মনে করা হয় যে পর্যটকের আকর্ষণ বাড়লে সুন্দরবনের সাথে রাজ্যের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। পর্যটনের কারণে সুন্দরবনের পুরানো ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশ বিদেশের ভ্রমণকারীরা সুন্দরবনের লোক-সংস্কৃতির আনন্দকে উপভোগ করতে চাই, সেজন্য পর্যটনের হাত ধরে সুন্দরবনের অনেক পুরানো ঐতিহ্য আজও বর্তমান। এছাড়া ম্যানগ্রোভ বনসম্পদের পরিবেশগত প্রভাবের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের উৎপাদন। বনসম্পদের এই বাস্তুতান্ত্রিক উৎপাদন শুধুমাত্র সুন্দরবন চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সীমানা পার করে এই এলাকা এখন আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের তথা এশিয়া মহাদেশে সুন্দরবনকে অক্সিজেনের ভাণ্ডার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেক পরিবেশবিদ সুন্দরবনকে দেশের ফুসফুস বলে অভিহিত করেছেন।

সুন্দরবনের বনসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ভারতীয় বনআইন

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বনের এই গুরুত্ব বনসম্পদের কারণে এবং এই বনসম্পদের সঠিক সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যই বনআইন তৈরি করা হয়েছে। বনসম্পদের সংরক্ষণের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য, কিন্তু সর্বদা এই সহযোগিতা পাওয়া যায় না আর তখনই আইন প্রণয়ণের দ্বারা বনসম্পদের রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ থাকে না। বনসম্পদকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্ট আইনকেই আমরা বনআইন বলছি। দেশভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পরেই সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সেভাবে ভাবা হয়নি, কারণ নতুন জাতীয় বা আঞ্চলিক সরকারের আশু সমস্যা ছিল ভাগচাষিদের ব্যবস্থাপনাও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন। ১৯৭০ এর দশকেই পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল।

সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় বনআইন কতটা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে যদি বলতে যায় তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে সুন্দরবন তথা ভারতীয় গ্রাম বাংলাতে পরিবেশ সচেতনতা কতটা প্রসার লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ ভাবনা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পরিবেশ চেতনা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক স্তরে সীমাবদ্ধ নেই, আন্তর্জাতিক স্তর ছাড়িয়ে আঞ্চলিক ভাবে তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশে এই সচেতনতা ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সুন্দরবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি মানুষের পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতার বিকাশ হওয়াটা একান্ত ভাবে কাম্য। পরিবেশ বা বন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে বন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীন ভারতে প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত আইন পাশ হয়েছিল ১৯৭২ সালের Stockholm

Conference এর পর। ১৬ই জুন ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ-সংক্রান্ত এই সম্মেলনে মানব পরিবেশ প্রসঙ্গে কিছু বৈশিষ্ট্য ও ২৬টি নীতি সংবলিত একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল। ঘোষণাপত্রের ওই ২৬টি নীতি হল-

১. স্বাধীনতা, সমতা ও উপযুক্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা, অর্থাৎ ভালোভাবে ও সম্মানের সাথে জীবনযাপনের পরিবেশ প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সকলের দায়িত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য এই পরিবেশকে রক্ষা ও উন্নত করা। এই প্রসঙ্গে বর্ণবৈষম্যের সমর্থন ও ক্রমব্যবহার, জাতিগত বিচ্ছিন্নকরণ, বৈষম্য, ঔপনিবেশিক ও অন্যান্য ধরণের নিপীড়ন এবং বিদেশি কর্তৃত্বের নীতিগুলিকে নিন্দা করা হয়েছে।[১৩]

২. বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে হাওয়া, জল, স্থলভাগ, উদ্ভিদ ও প্রাণী সমেত পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিশেষত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের নিদর্শনস্বরূপ নমুনাগুলিকে যথোপযুক্ত সাবধানতাসহ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে।

৩. জরুরী পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদসমূহ উৎপাদনে পৃথিবীর ক্ষমতাকে স্থিতাবস্থায় রাখতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তা পুনরুদ্ধার বা উন্নত করতে হবে।

৪. বন্যপ্রাণী এবং তাদের বাসস্থলের যে পরম্পরা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ঘটনার সমন্বয়ে আজ বিপদগ্রস্ত তাকে রক্ষা করার ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ দায়িত্ব মানুষের রয়েছে।

৫. ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার হয়ে যাওয়া অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদগুলিকে বাঁচিয়ে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং এই ব্যবহারের সুফল যাতে সমগ্র

মানবজাতিই ভোগ করতে পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে বন্যপ্রাণী সহ প্রকৃতি-সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক অথবা অপরিবর্তনীয় ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চিতভাবে রোধ করবার জন্য এমন গাঢ়ত্বের বিষাক্ত বা অন্যান্য পদার্থের নিঃসরণ বা তাপ বর্জন বন্ধ করতে হবে, যেগুলি পরিবেশের দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যায় না। দূষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ন্যায়-সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে।

৭. বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা সমুদ্রের দূষণ যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, সামুদ্রিক অন্যান্য জীব সম্পদের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সমুদ্রের অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে বাধাস্বরূপ। সেগুলি বন্ধ করবার জন্য রাষ্ট্রসমূহ সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮. জীবনযাপন ও কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করবার জন্য এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপযোগী অবস্থা পৃথিবীতে গড়ে তোলার জন্য প্রধান প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

৯. অনুন্নত অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত দুর্বলতা গভীর সমস্যা তৈরি করেছে এবং সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনে সময়মত সাহায্য প্রদান।

১০. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশগত পরিচালন ব্যবস্থার জন্য প্রধান প্রয়োজন মূল্যমানের স্থায়িত্ব এবং প্রাথমিক উপাদান ও কাঁচামালের থেকে পর্যাপ্ত আয়, কারণ অর্থনৈতিক ব্যাপার ও বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুটোকেই হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে।

১১. সমস্ত দেশগুলির পরিবেশ নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করবে। কখনো উল্টোটা করবে না বা সবার জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনেও বাধা সৃষ্টি করবে না। পরিবেশগত ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

১২. উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে, তাদের উন্নয়নের পরিকল্পনাতে পরিবেশ রক্ষাকারী ব্যবস্থার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যায়ভার এবং পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অনুরোধ অনুসারে বাড়তি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও পরিবেশের উন্নয়নকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেশগুলোকে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বার্থে মানব পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতির সহায়ক একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

১৪. উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষার যে কোন বিরোধ সমাধানের মূল সহায়ক হচ্ছে যুক্তিসম্মত পরিকল্পনা।[১৪]

১৫. মানুষের বসতি এবং নগরায়নের জন্য যে সব প্রকল্প গৃহীত হবে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেন পরিবেশের উপর না পড়ে এবং সকল মানুষ যাতে দূষণ মুক্ত পরিবেশ ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬. জনসংখ্যা নীতি রূপায়ন ও প্রয়োগের ফলে মৌল মানবাধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত অঞ্চলের পরিবেশের উপর ঘন জনবসতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে, সরকারের উচিত সেইসব অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১৫]

১৭. পরিবেশের মানোন্নয়নের জন্য দেশের পরিবেশ-সম্পদের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উপযুক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

১৮. যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের ফলে আর্থিক ও সামাজিক বিকাশ দ্রুত ঘটছে, সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পরিবেশ বিপর্যয় ও বিপদ প্রতিরোধে ব্যবহার করতে হবে। মানবজাতির কল্যাণে পরিবেশ সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা বিরাট।

১৯. মানবিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনমত গঠনের জন্য তরুণ প্রজন্ম এবং বয়স্কদের জন্য পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২০. প্রতিটি দেশে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ সমস্যার গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এই যে, গণ মাধ্যমের বিরাট দায়িত্ব আছে পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রতিটি দিক থেকে পরিবেশকে উন্নত করবার জন্য মানুষকে যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে।

২১. পরিবেশ নীতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের এক্তিয়ার অতিক্রম করবে না এবং একটি রাষ্ট্রের কার্যকলাপ অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় এক্তিয়ারের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের নীতি অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে নিজেদের সম্পদকে পরিবেশ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সদ্ব্যবহার করবার।

২২. রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যাবলীর ফলে যদি রাষ্ট্রসীমা-বহির্ভুক্ত অঞ্চলে কোনো পরিবেশজনিত ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে ওই রাষ্ট্রকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এবং দূষণ-আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে আরও কঠোর ভাবে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে।[১৬]

২৩. আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত 'মানের' প্রতি অশ্রদ্ধা না জানিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি দেশের পরিবেশ-নীতির 'মান' নির্ধারণের সময় সেই দেশের বিদ্যমান মূল্যবোধকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

২৪. ছোটো-বড়ো সমস্ত দেশগুলোর সমান গুরুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পরিবেশের রক্ষণ ও উন্নতি-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপার কার্যকর করতে হবে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস ও দূরীকরণের জন্য দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই সেক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

২৫. প্রতিটি রাষ্ট্র এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করবে যে, আন্তর্জাতিক সংগঠন পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এক সমন্বয়ী, দক্ষ এবং গতিশীল ভূমিকা পালনে সক্ষম।

২৬. মানুষ এবং তার পরিবেশকে পারমানবিক অস্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সকল রাষ্ট্রের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা অবশ্য কর্তব্য, তাহলেই এই সব মারণস্ত্রের অপসারণ ও সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভবপর হবে। ষ্টকহোম সম্মেলনের মূল কথাই হল "man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of

dignity and well-being"।[১৭] এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্যগুলোর মূল কথা হল- "সমস্ত বিশ্বব্যাপী মানুষকে এমন ভাবে কাজ করবে যাতে পরিবেশ বিনষ্ট না হয়। পরিবেশের স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিক, গোষ্ঠী, সরকার, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উদ্যোগ প্রভৃতি সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সকল সরকার ও জনগণকে মানবীয় পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল, মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে"।[১৮]

১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ৪৮ক ধারা এবং ৫১ক ধারা অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ৪৮ক ধারায় বলা হয়েছিল যে- "Protection and improvement of Environment and safeguarding of Forests and Wildlife : The State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country"।[১৯] এই ধারাতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে বনভূমি ও বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তাকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই কাজকে সুস্থ ভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে। ৫১ক ধারাতে বলা হয় যে, 'পরিবেশের সুরক্ষা ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করা ভারতের প্রতিটা নাগরিকের কর্তব্য'। ৫১ক ধারার শিরোনাম হল মৌলিক কর্তব্য। "It shall be the duty of every citizen of India… to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures."[২০]

সংবিধানে রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের বনগুলোর পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।[২১] পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে একটা ভারসাম্যমূলক মেলবন্ধন একান্ত

কাম্য। নাহলে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। ভারসাম্যহীন পরিবেশে মানুষ তথা সমগ্র প্রাণীকুল বিপন্ন। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ সাকলের কাম্য। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারাতে প্রদত্ত জীবনের অধিকারের অংশ হল পরিবেশের অধিকার। এই প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে- 'All human beings have the fundamental right to an environment adequate for their health and wellbeing'।[২২] ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বন্যপ্রাণ (সুরক্ষা) আইন পাশ হয়েছিল। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল-'An Act to Provide for the protection of wild animals, or incidental thereto'।[২৩] ১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, পাশ হয়। এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল- "An Act to provide for the prevention and control of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water, for the establishment, with a view to carrying out the purposes aforesaid, of Boards for the prevention and control of water pollution, for conferring on and assigning to such Boards powers and functions relating thereto and for matters connected therewith"।[২৪] ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বারা ১৯৮১ সালের ২৯ মার্চ The Air (prevention and Control of pollution) Act, পাশ হয়। এই আইনের প্রধান লক্ষ্য হল-"An Act to provide for the prevention, control and abatement of air pollution, for the establishment, with a view to carrying out the aforesaid purpose of Boards, for conferring on and assigning to such Boards powers and functions relating thereto and for matters connected therewith"।[২৫]

এককথায় ১৯৭২ সালের ষ্টকহোম সম্মেলনের পর থেকেই ভারতীয় পার্লামেন্টে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। ১৯৭২ সালের পর থেকেই ভারতীয়

পরিবেশ আইন সম্পর্কিত বহু আইন একের পর এক প্রণয়ন হতে শুরু হয়েছিল। এই সম্মেলনে সুন্দরবনের উপরেও সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কারণ ১৯৭২ সালের ঐ সম্মেলনের আগে স্বাধীন ভারতীয় সুন্দরবনের তেমন উন্নয়ন চোখে পড়েনি। ১৯৭২ এর সম্মেলনের পরেই সুন্দরবনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ওঠে। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ওঠার পর থেকে সুন্দরবনের ইতিহাসে নানা ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিক সুন্দরবন রূপায়নের ধারণার প্রকাশ ঘটে। একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ওঠে। ওই বছরেই ব্যাঘ্র প্রকল্পও গড়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালে সুন্দরবন কুমীর প্রকল্প গড়ে ওঠে। ওই বছর আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছিল। সজনেখালী, লেথিয়ান দ্বীপ ও হ্যালিডে দ্বীপকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে সুন্দরবনের জীবমণ্ডল সংরক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং ১৯৮৪ সালে সুন্দরবনের সম্মানে নতুন পালকের সংযোগ হয়েছিল। অর্থাৎ সুন্দরবনকে বিশ্বের জীববৈচিত্রের অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল (World Heritage Site)।

১৯৮০ সালে ভারতীয় অরণ্য সংরক্ষণ আইন পাশ হয়েছিল। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে দশম ও একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলা যেতে পারে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বলা হয়েছিল যে, “Sustainability is not an option but imperative. For a better world to live in we need good air, pure water, nutritious food, healthy environment and greenery around us. Without sustainability environmental deterioration and economic decline will be feeding on each

other leading to poverty, pollution, poor health, political upheaval and unrest… We need to tackle the environmental degradation in a holistic manner in order to ensure both economic and environmental sustainability"।[২৬] একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বলা হয়েছিল যে, "Protection of the environment has to be a central part of any sustainable inclusive growth strategy. This aspect of development is especially important in the Eleventh plan when consciousness of the dangers of environmental degradation of environmental degradation has increased greatly"।[২৭]

আঞ্চলিক স্তরের পরিবেশ ভাবনা ও পরিবেশ সংরক্ষণও সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে জাতীয় পরিবেশ আইনের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব গ্রামীণ পঞ্চায়েত আইনেও পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল। পরিবেশের উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছিল- সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজন, জমি উন্নয়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, জল পরিচালনা ও জলাশয় উন্নয়ন ১৯৯২-এর সংশোধনের ফলে যুক্ত হয়েছে; পাশাপাশি রাস্তার দুধারে ও এলাকার অন্যত্র গাছ লাগানো ও গাছের যত্ন নেওয়া; পানীয় জলের সরবরাহ করা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[২৮] ১৯৮০ সালে প্রকাশিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনামূলক কার্যাবলী লক্ষ্য করা যায়। ঐ অ্যাক্টে বলা হয়েছিল যে, রাস্তার দুই ধারে ও অন্যত্র গাছ লাগানো ও সেই গাছের সঠিক প্রতিপালন করতে হবে। রাস্তাঘাট জল দিয়ে পরিষ্কার রাখা। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।[২৯] সুন্দরবনের সংরক্ষণ কলকাতার অ্যাক্টের দ্বারাও প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ

সুন্দরবনের অস্তিত্বের সঙ্কট হলে কলকাতা বিনষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।[৩০] ১৯৯৩ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের মধ্যেও আমরা পরিবেশ সংরক্ষণের নানা ধরণের ব্যবস্থা বা নীতি দেখতে পেয়েছি, যেমন- ময়লা, আবর্জনা ও অন্যান্য অপ্রীতিকর দূষিত বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ। জল নিকাশী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদি।[৩১]

প্রসঙ্গ পরিবেশ আন্দোলন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের রক্ষার জন্য যখন ভারতীয় সংবিধানে আইন প্রণয়ন হচ্ছে এবং সরকারী নানা ধরণের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য, পরিবেশের সুরক্ষা সাধনের জন্য হওয়া আন্দোলনের কথা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। পরিবেশ রক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলনকে আমরা পরিবেশ আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সুন্দরবন ও জাতীয় স্তরের বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন সমস্ত পর্যায়ে দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাস এবং পরিবেশ ভাবনা ও চর্চাতে পরিবেশ আন্দোলনের উল্লেখ করাটা একান্ত কাম্য। পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে সবার আগে সকলের মনে একটা প্রশ্নের জন্ম হয় যে, এই পরিবেশ আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে? কারও মতে এই আন্দোলন সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে মানব সমাজেরই আন্দোলন। আবার কারও মতে পরিবেশ দূষণের শিকার সবাই হলেও এরজন্য দায়ী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার যুক্ত শাসক ও বড় ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাই এই আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধে।[৩২] অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই আমাদের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করা হলেও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ কিন্তু এই লক্ষ্যে চালিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে না। পরিবেশ সচেতনতার দ্বারা চালিত হলেও তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। যেমন- উচ্ছেদের আশঙ্কা, জীবনের আশঙ্কা, জীবিকার আশঙ্কা ইত্যাদি। অনেকে আছে যারা এই সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে গিয়েও আন্দোলন করেছে, এই প্রসঙ্গে তুষার কাঞ্জিলালের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[৩৩] পরিবেশ যেহেতু জীবন জীবিকার সাথে সম্পূর্ণ যুক্ত তাই পরিবেশকেন্দ্রিক এই আন্দোলনগুলোকে পরিবেশ আন্দোলনের মর্যাদা দেওয়া যুক্তিযুক্ত। সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, মরুভূমির প্রসার, দূষণের মাত্রাবৃদ্ধি, আমাদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানা ধরনের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয়ে চলেছে। এই সমস্ত পরিবেশ বিরোধী উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বারা সবসময় স্থানীয় মানুষ প্রভাবিত হয়। কারণ স্থানীয় মানুষের উপর এই সমস্ত প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আলোচ্য পর্বে তেমনই কয়েকটি পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

১৯৭৩ সালে চিপকো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সারা ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। উত্তর প্রদেশের হিমালয় অঞ্চলের চিপকো আন্দোলন আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা। হিমালয়ের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ হল বন। এই বনসম্পদ রক্ষা করার জন্য গাছ কাটার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। একটি অঞ্চলের গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলনটি শুরু হলেও পরবর্তীকালে সুন্দরলাল বহুগনার নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনকে পৃথিবীর পরিবেশ আন্দোলনগুলোর মধ্যে

অন্যতম সেরা পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে প্রতিপন্য করা হয়।[৩৪] ১৭৭৯ সালের ৯ জানুয়ারী সুন্দরলাল গাছ কাটা বন্ধের দাবীতে অনশন শুরু করেছিল, কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ৩১ জানুয়ারী সুন্দরলাল জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে সুন্দরলাল হিমালয়ের ১০০০ মিটার উপরের গাছ কাটা বন্ধের জন্য আবারও অনশন শুরু করেন, কিন্তু এবার বিষয়টা প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নজরে পড়ে। সরকার কমিটি গঠন করে ও হিমালয়ের ১০০০ মিটারের উপরের গাছ কাটা সম্পূর্ণ ভাবে আইনত বন্ধ করে দেয়। ফলে চিপকো পরিবেশ আন্দোলন সফল হয়। চিপকো আন্দোলন সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহর মন্তব্য- "Social Movements have a Pre-History and an afterlife many popular struggles are kept alive long after they become inactive, their memory and myth continuing to inspire later generations"।[৩৫]

সুন্দরবনের পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরের ডোলা রোড গ্রামের রাসায়নিক সার প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই কোম্পানি বার্ষিক ৩৩০০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড ও ৬৬০০০ টন সুপার ফসপেট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাদের প্রকল্প রূপায়নের সূচনা করতে চেয়েছিল।[৩৬] কোম্পানির মতে, স্বাধীনতার পর থেকে সুন্দরবনের কৃষি ও শিল্পে কোন উন্নয়ন ঘটেনি, সেই কারণে এই অঞ্চল সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। যদি এই রাসায়নিক সার কোম্পানি এই এলাকাতে তাদের উৎপাদন শুরু করতে পারে তাহলে এখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে এলাকার মানুষও লাভবান হবে।[৩৭] ওই এলাকার মানুষ কোম্পানির এই যুক্তিকে সমর্থন করেনি। সাধারণ আন্দোলনকারীরা কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলেছিল। তারা বলেছিল যে,

এই ধরণের একটি বিপজ্জনক পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গাটি নির্বিচারে নির্বাচন করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচনের জন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল এবং পরিবেশের দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল। এছাড়া প্রস্তাবিত জায়গাটি ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামের খুব কাছাকাছি ছিল এবং এখানকার কৃষিজমি খুবই উর্বর ছিল। সুন্দরবনের পানীয় জলের প্রধান অবলম্বন গভীর নলকূপের এক মাইলের মধ্যে এই কারখানার অবস্থান ছিল।[৩৮] এছাড়াও তারা বলেছিল এই উৎপাদন প্রক্রিয়া দূষিত ধোয়াকে নিঃশেষ করবে। ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া এই দূষণের জন্য দায়ী হবে। এর ধুলো বাতাসকে দূষিত করবে এবং আশে-পাশের এলাকার জল ও কৃষিজমিকে দূষিত করবে। সালফার ডাই অক্সাইড বায়ুকে দূষিত করবে এবং এটি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, পাল মোনারি এমফিসেমা ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি করবে। ফসফরাস মানব দেহে প্রবেশ করবে এবং কিডনিতে রোগ সৃষ্টি করবে।[৩৯]

সামগ্রিক ভাবে আন্দোলনকারীরা বলেছিল যে, দূষণ সুন্দরবনের প্রচলিত বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে, যার প্রভাব পড়বে কৃষি ও মৎস্য চাষে। রাসায়নিক বর্জ্য জলে মিশে দীর্ঘ মেয়াদে জলজ জীবনকে ধ্বংস করে দেবে।[৪০] জনগণের এই যুক্তি তৎকালীন সরকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর থেকে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিঘ্নিত না করে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।[৪১] তাই কোম্পানি তাদের দাবিকে ন্যায্যতা দিতে পারেনি যে, এই প্রকল্পটি এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এছাড়া এই প্রকল্প পরিবেশ আইন ও নিয়ম লঙ্ঘণ করেছিল। যেমন- The Factory Act of 1948(১৯৮৭ সালে সংশোধিত), The Environment (Protection) Rule, 1986 No.5 Under

Environment Protection Act।[৪২] কারখানা আইনে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কোন বিপজ্জনক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়, তাহলে একটি এলাকা মূল্যায়ন কমিটি তৈরি করতে হবে এবং ওই কমিটির রিপোর্টকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার পর প্রকল্প মঞ্জুর করা হবে কি হবে না সেটা ঠিক করা হবে। অথচ এই সার কোম্পানি কোন কমিটি গঠন করেনি। সংবিধানের Article 48, Section B তে বলা হয়েছে যে, কোম্পানিকে তার প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আশেপাশের সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটাও করা হয়নি। এই সার কোম্পানি আইনের চরম লঙঘণ করেছে। তাই নিজেদের পরিবেশকে বাঁচাতে রাসায়নিক সার কোম্পানির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের বিরোধিতা করে স্থানীয় জনগণ। আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কোম্পানির দ্বারা ভাগচাষিদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরোধিতা করে।[৪৩] বেআইনি ভাবে জমি ক্রয় শুরু হয়েছিল। তৎকালীন বাজার অনুযায়ী এক বিঘা জমির দাম ছিল তিন হাজার টাকা। অথচ কোম্পানি পাঁচ হাজার টাকা কোথাও দশ হাজার টাকা দিয়েও জমি কেনা শুরু করেছিল। কোম্পানির এই সমস্ত অনিয়ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।[৪৪] ভূপালে Union Carbide কারখানা থেকে Methyl Iso Cyanate (MIC) নামক গ্যাস লিক হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯৮৪ সালের ২রা ডিসেম্বর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ভুপালে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। সাম্প্রতিক Centre for Science and environment এর রিপোর্টে ভূপালের Union Carbide কারখানা অঞ্চলের মাটিতে ‘chronic toxicty’ আছে বলে জানা গেছে।[৪৫]

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ছিল পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী একটি আন্দোলন, যার প্রসার বিশ্বব্যাংক থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নর্মদা নদী মধ্য ভারতের সব থেকে লম্বা নদী। এই নদীর উপত্যকায় নানাবিধ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার 'নর্মদা ভ্যালি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট (NVDP)' গঠন করে। এই প্রজেক্টে মোট ৩০টি বড় বাঁধ, ১৩৫টি মাঝারি বাঁধ, ৩০০০টি ছোট বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল।[৪৬] এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল জল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জলের ব্যবস্থা করে গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজেস্থানের মধ্যেকার আন্ত-রাজ্য বিরোধ দূর করা। কিন্তু এই প্রকল্পের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে অন্ধকার ছায়া নেমে এসেছিল। জমি, বাড়ি, এবং এত দিনের সমাজ সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। প্রচুর জঙ্গল বিনষ্ট ও জঙ্গলে বসবাসকারী বন্য প্রাণীদের জীবনে সঙ্কট নেমে এসেছিল। ফলে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল যে- 'এই প্রকল্পের দ্বারা উপকার হওয়ার থেকে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হবে, যে ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করাটা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না'। কিন্তু বহু প্রচেষ্টা পরেও এই প্রকল্প সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সরকার ও আদালত সম্মত হয়নি। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মতামতটা খুবই গুরুত্বপূর্ন। সুপ্রিম কোর্টের মতে "The displacement of the tribal and other persons would not per se result in the violation of their fundamental or other rights. The effect is to see that on their rehabilitation at new locations they are better off than what they were"।[৪৭] অর্থাৎ এই প্রকল্প জনস্বার্থ বিরোধী নয়, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জলের প্রয়োজন। এছাড়া বাঁধের জন্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা উৎখাত হলে তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে না, কারণ নতুন

জায়গায় ওরা যেন আগের থেকে ভালো থাকে সরকার তার সুস্থ ব্যবস্থা করবে। দেশের বনভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ২৩/০৪/২০০৪ এর বিজ্ঞপ্তিকে সাংবিধানিক ও বৈধ বলে ঘোষণা করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) গঠন করা হয়েছিল, যার কাজ ছিল ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের জন্য অর্থ জোগাড় করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বনভূমি ও বনসম্পদকে রক্ষা করা।[৪৮]

সুন্দরবনের প্রতিকূলতা ও প্রতিকূলতার উন্নয়নে স্থানীয় পদক্ষেপ

বনসম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে সাথে আমাদের আরও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হল সুন্দরবনের বিপর্যয়। কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলের উন্নয়নের পথে একমাত্র বাধা। অথচ এই বাধাকে কোন ভাবেই সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তাই এই বাধার মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই বিপর্যয়ের দ্বারা সুন্দরবনের বনসম্পদ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই আলোচ্য প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনে বিপর্যয় ও এই বিপর্যয়ের মোকাবিলায় কি কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কররা চেষ্টা করেছি।

নদীবাঁধ জনিত সমস্যা

সুন্দরবনের প্রধান প্রতিকূলতার মধ্যে অন্যতম হল নদীবাঁধের সমস্যা। আবহমান কাল থেকে নদীর সাথে মানুষের সম্পর্ক। মানব সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই নদীর ধারে গড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহর। সুন্দরবনের নদীবাঁধের আয়তন ৩৫০০ হাজার কিলোমিটার। এই বাঁধকে সুন্দরবনের 'জীবন রেখা' বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা

নদীবাঁধের সমস্যা। নদী বাঁধের যা অবস্থা তাতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে। প্রতিবছর কোথাও না কোথাও নদীবাঁধের ভাঙন সুন্দরবনের অগ্রগতির পথে সবথেকে বেশি বাঁধা সৃষ্টি করছে। সুন্দরবনের বাঁধের ইতিহাস দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, নদীবাঁধের কাজ শুরু করেছিল জমিদাররা। অর্থাৎ জমিদাররা তাদের নিজের প্রয়োজনে নদীতে বাঁধ দিয়েছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির কাছ থেকে ইজারা নিয়ে তারা বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল। এই কাজে কোনো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে নদীর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই বাঁধ জন্মলগ্ন থেকেই মজবুত ছিল না। সেই কারণে যখন তখন ভেঙে যেত।[৪৯] ফলে সুন্দরবনের এলাকা বারবার জলমগ্ন হয়ে গিয়ে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করত। ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার ফলে নদীর বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের উপরে ন্যস্ত হয়। পরে এই দায়িত্ব রাজ্য সেচ ও জলপথ বিভাগ গ্রহণ করে।[৫০] সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঁধ মাটির তৈরি। তাই খুব বেশী মজবুত হয় না। ফলে বর্ষার সময়, ঝড়ের সময়, জোয়ার ভাটার সময় নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া নদীর পাড়ের ভাঙনের ফলেও নদীবাঁধ অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভাঙন প্রতিরোধ করতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের চারা লাগানো খুবই কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। সেজন্য সম্প্রতি নদীর চরে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানোর পন্থা গ্রহণ করেছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, কারণ এই গাছের ফলে নদীর জোয়ারের সময় জলের ঢেউ সরাসরি নদীবাঁধে এসে আঘাত হানতে পারে না। এছাড়া বাঁশের দরমা, বালি ভর্তি সিমেন্টের বস্তা, বাঁশের পাইলিং, বাঁশের খাঁচারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে সুন্দরবনের নদীর ভাঙন প্রতিরোধ করতে।

নদীবাঁধ সংরক্ষণের সমস্যা

নদীবাঁধ সংরক্ষণের কাজের সাথে যুক্ত কার্যপ্রণালী রূপায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেচ দপ্তরকে, কারণ সুন্দরবনের নদীগুলো খুবই খরস্রোতা, তাই নদীবাঁধের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় সেগুলি হল- সুন্দরবনের জনবসতি স্থাপনের শুরুতে নদীবাঁধের কাজটা সম্পন্ন করেছিল স্থানীয় জমিদাররা। জমিদাররা ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলেপূর্ণ এলাকাগুলিকে ইজারা হিসাবে নিয়েছিল। কোনো আধুনিক পরিকল্পনা ছাড়ায় নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি হলে নদীবাঁধের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আসে। এই দায়িত্ব হস্তান্তরের পরেও তেমন কোনো উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়নি নদী বাঁধের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি সুন্দরবনের নদী বাঁধের আয়তন ৩৫০০ কিলোমিটার। এই বাঁধের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থ পুরোপুরি ভাবে সরকারি পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা হয় না। আবার যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয় তার পুরোটা কাজে লাগানো হয় না। এর কারণ সুন্দরবনের রাজনীতি। অর্থাৎ এই অঞ্চলের বেশির ভাগ রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নিম্নমানের। ফলে তারা তাদের জীবনধারণের জন্য রাজনীতিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাই যে পরিমাণ অর্থ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয় তার অনেকটা এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের পকেটে চলে যায়। যার ফলে সুন্দরবনের উন্নয়নে ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হয়ে চলেছে।[৫১] নদীবাঁধ সংরক্ষণের একটি প্রধান সমস্যা হল নদীর স্রোত ও জোয়ারের সময় জলের ধাক্কা। অর্থাৎ সুন্দরবনের নদীগুলি খুবই স্রোত প্রবণ। ফলে জোয়ারের সময় জলের গতিবৃদ্ধি পাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল নদীর সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়তে চাই। অথচ সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায় নদীবাঁধ। ফলে নদীর জল তীব্র বেগে এসে বাঁধের উপরে ধাক্কা মারে, এবং এই ধাক্কার ফলে নদীবাঁধের ক্ষতি হতে শুরু করে, যা সুন্দরবনের নদীবাঁধের সংরক্ষণের একটি অন্যতম সমস্যা।

ভরা কোটালের সময় নদীতে জল বেড়ে যাওয়া, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি কারণে নদীর বাঁধ ভেঙে পড়ে। ২০০৯ সালে আয়লার তাণ্ডবে সুন্দরবনের ৭০০ থেকে ৮০০ কি.মি নদীবাঁধ ভেঙে সুন্দরবনের বিরাট এলাকা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বারবার বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের কারণে সুন্দরবনের সাথে সাথে রাজ্যের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়ছে। কারণ এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি ও নদীবাঁধ মেরামতের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যা সুন্দরবনের নদীবাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং নদীবাঁধ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস যে একটি বাধা স্বরূপ সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া সুন্দরবনের খুব কাছে বঙ্গোপসাগর, তাই সুন্দরবনের নদীগুলিতে জলের প্রবাহ বা নদী স্রোত খুবই শক্তিশালী। এই গতি ঝড়ের সময় আরও বৃদ্ধি পাই। যার ফলে খুব সহজে সুন্দরবনের নদী বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জল জনবসতিপূর্ণ এলাকাতে প্রবেশ করে। কারণ নদীর জলকে প্রতিরোধ করার জন্য নদী বাঁধের উচ্চতা যতটা হওয়া প্রয়োজন, সেই উচ্চতা সুন্দরবনের বেশির ভাগ স্থানের বাঁধের নেই।

সুন্দরবনের জোয়ার-ভাঁটা প্রবণ এলাকাতে বাঁধ তৈরির জন্য মাটি পাওয়া যায় না। কারণ জোয়ার-ভাঁটার মাঝে সময়ের ব্যবধান খুবই অল্প। ফলে যে মাটি পাওয়া যায় সেটা

বাঁধ তৈরির পক্ষে উপযোগী নয়। অথচ অন্য কোনো উপায় না থাকার ফলে ওই মাটি দিয়ে বাঁধ দিতে হয়। এই বাঁধ শক্তিশালী হয় না, দুর্বল প্রকৃতির হয়, যার ফলে খুব সহজেই জলোচ্ছ্বাসের সময় বাঁধ ভেঙে যায়। সুন্দরবনের বেশিরভাগ অঞ্চল বিপদসংকুল ও বন্যা প্রবণ। এই কারণে বাঁধের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না।[৫২] মোহনার কাছাকাছি নদীগুলোতে জোয়ারের সময় প্রবল বেগে নদীর জলপ্রবাহ প্রবেশ করে। আবার ভাঁটার সময় প্রবল বেগে ওই জলপ্রবাহ ফিরে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নদীতে বাঁধ দিলে বাঁধের গোড়ায় একপ্রকার ফাটল বা হোলের সৃষ্টি হয়। এই কারণে অনেক সময় নদীর বাঁধ ভেঙে পড়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই মূহুর্তে তৎক্ষণাৎ নদীর নোনা জলের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য বাঁধের কিছুটা দূর থেকে আরও একটি বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজে নতুন জমির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ওই জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ নদী বাঁধের পাশের জমিতে সাধারণ মানুষের বাসস্থান গড়ে উঠেছে। সেই সাথে চাষের জমিও তৈরি হয়ে গেছে। ফলে সুন্দরবনবাসীরা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে বাঁধ নির্মাণের জন্য জমি দিতে রাজি হয় না। যদি সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তারা সরে যেতে রাজি হয়। ভারতীয় আইনী ব্যবস্থার একটা পদ্ধতি আছে, যার ফলে ওই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সাথে সাথে করা সম্ভব হয় না। তার জন্য অনেকটা সময় লাগে। আর এই কারণে সুন্দরবনের মত দরিদ্র এলাকাতে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের শেষ অবলম্বনকে হাতছাড়া করতে রাজি হয় না। ফলে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়।[৫৩]

বর্তমানে সুন্দরবনের নদী সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল নদীর গভীরতা কমে যাওয়া। নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার একটি ক্ষতিকর প্রভাব নদীবাঁধের উপরে

পড়ছে। বাঁধের উচ্চতার একটা সীমা আছে কিন্তু নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে নদীবাঁধের উচ্চতা বাড়াতে হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নদীর বাঁধ কেটে জল ঢুকিয়ে মাছ চাষ। যার ফলে বাঁধের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে নদীর বাঁধ কেটে জল ঢুকিয়ে ফিসারি করে মাছ চাষ করা হয়। এই কাজে হয়ত বেশ কিছু মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নদীবাঁধ।[৫৪] এই সমস্ত কারণে সুন্দরবনের নদীবাঁধের উপরে সঠিক ভাবে লক্ষ্য রাখা বা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে সুন্দরবনের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফল বিভিন্ন সময়ে হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস হয়। উদাহরণ হিসাবে ২০০৯ সালের আয়লার কথা ধরা যাক। নদীবাঁধের অবস্থা যদি একটু ভালো হত তাহলে সুন্দরবনের ইতিহাসে এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়ত হত না। শুধুমাত্র নদীবাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দুর্বলতার কারণে এত বড় ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটেছিল।

বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত সমস্যা

সুন্দরবনে বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং এই বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র এলাকাতে উন্নয়নের গতি বারবার থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে বন্যা একেবারে সুখদায়ক নয়। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল চিন্তা বা ত্রাস হলো নদীর নোনাজল। বাঁধ ভেঙে এই জল যেখানে যেখানে প্রবেশ করবে সেখানে সেখানে পরবর্তী তিন-চার বছর আর কোনো ভালো ফসল উৎপাদন হবে না। তাই সুন্দরবনের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষিকাজের অবক্ষয় সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের জীবনে দারুণ প্রভাব

ফেলে। ফলে সুন্দরবনের ইতিহাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবসময় বেদনাদায়ক। এমনই বেশ কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, যার প্রভাব সুন্দরবনের ইতিহাসে আজও স্মরণীয়। ১৯৭০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি ছিল নিম্নরূপ:[৫৫]

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার বছর	**বিপর্যয়ের ধরণ**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান**
১০.০৯.১৯৭০	ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা	৩১,২০০ জন মানুষ বন্যার কারনে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।
২৮.৩০.১৯৭১	ঘূর্নিঝড় ও প্লাবন	বাংলাদেশে ৭০৮ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এর সাথে সাথে অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল।
৩০.০৮.১৯৭৩	ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস	ঘরবাড়ি সহ অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি।
০৮.১০.১৯৭৮	ঘূর্নিঝড়	বাড়ি চাপা পড়ে দুই চব্বিশ পরগণায় ৯২ জনের মৃত্যু।
১০.০৪.১৯৮১	বন্যা, ভূমিকম্প ও ঘূর্নিঝড়	ভারতীয় সুন্দরবনে ২২ জনের মৃত্যু।
০৫.০৩.১৯৯৩	জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন	বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন, জীবন ও সম্পদ হানি।
১৬.০৫.১৯৯৫	নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা ও ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস।	মানুষ, গবাদি পশু, বন্য সম্পদের বিরাট ক্ষতিসাধন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার বছর	বিপর্যয়ের ধরণ	ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান
২৯.১১.১৯৮৮	হ্যারিকেন ঝড়, ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৭৫ কি.মি।	দুই দেশে গাছ পড়ে ও বাড়ি চাপা পড়ে ১০১ জনের মৃত্যু।
১৯.০৯.২০০৬	ঘূর্নিঝড়	৩০ জনের মৃত্যু ও ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটের ভাঙন।
২২.০৫.২০০৭	ঝড় ও বন্যা	বাংলাদেশে ২০০০ জনের মৃত্যু। গৃহহারা বহু মানুষ।
০৪.১১.২০০৮	নার্গিস ঝড়	বাংলাদেশের সুন্দরবনে ১৫০ জনের মৃত্যু। বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। অনেক মানুষ নিখোঁজ।
২৫.০৫.২০০৯	আয়লা ঝড়	ভারত, বাংলাদেশ দুই ভূখণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। মানুষ মৃত্যুর সঠিক হিসাব এখনও মেলেনি। নদীবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন।

সুন্দরবনের ইতিহাসে এই সমস্ত বিপর্যয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ১৯৭০ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের লক্ষাধিক অর্থের ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে এই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এরপর কিছুটা সময় ঠিকঠাক চলার পরে ১৯৮১ সালের বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস এর ফলে আবার বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সুন্দরবনকে। বাঁধ ভেঙে

নদীর নোনাজল সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল, এবং বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৮৮ সালের প্রতি ঘণ্টায় ২৭৫ কি.মি. বেগে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সুন্দরবনের সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পূর্বের সমস্ত বিপর্যয়কে হার মানিয়ে দিয়েছিল। এই বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নজিরবিহীন।[৫৬] এরপর ২০০৯ সালের আয়লা, যার ধ্বংসলীলা পূর্বের সমস্ত বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ভুলিয়ে দিয়েছিল। যার প্রভাব থেকে এই অঞ্চলের মানুষ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারেনি। বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে নদীর বাঁধ অঙ্গাঙ্গিক ভাবে যুক্ত, কারণ এই বন্যা ও বিপর্যয়ের ফলে নদীবাঁধের ভাঙন ধরে। সাধারণ ঝড় বা বিপর্যয় ঘটলে তার ক্ষণস্থায়ী একটি ক্ষতিকর প্রভাব থাকে, যে প্রভাব থেকে সুন্দরবনের মানুষ খুব তাড়াতাড়ি একটি সমাধান সূত্র খুঁজে পায় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু নদীবাঁধের ভাঙনের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয় তার থেকে মুক্তি পেতে সুন্দরবনের মানুষকে একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করতে হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা

সুন্দরবনের যে সমস্ত সমস্যার কারণে বর্তমানে সুন্দরবন বিপর্যয়ের মুখে তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা। বর্তমানে সুন্দরবনের অরণ্যের পরিধি ক্রমাগত হ্রাস পেলেও জনসংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষের কম। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৪ লক্ষ। ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩২ লক্ষ। এখন সুন্দরবনের জনসংখ্যা প্রায় ৪৪ লক্ষের মতো। অর্থাৎ ৫০ বছরে লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষের

বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫৭] গত ১৯৫১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-

ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ।	১১,৫৯,৫৫৯ জন।	৫৪%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।	১৪,৪৬,২৪২ জন।	৮০%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।	১৮,০০,০০০ জন।	৮০%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।	২৭,০০,০০০ জন।	৬৭%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।	৩২,০৫,৫২৪ জন।	৮৪%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।	৩৭,৫৭,৩৫৬ জন।	৭৬%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।	৪৪,২৬,২৫৯ জন।[৫৮]	

এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সুন্দরবনের পরিবেশে তথা সমস্ত ব্যবস্থাকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করছে। সাথে সাথে গভীর সঙ্কটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।[৫৯]

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি হল একজন সুস্থ মানুষের প্রাথমিক চাহিদা। কিন্তু সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই প্রাথমিক চাহিদার ক্ষেত্রে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবথেকে ক্ষতিকর প্রভাব খাদ্যের উপরে পড়ে। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, যা বর্তমান পরিস্থিতিকে দিন দিন অস্থির করে তুলছে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও কৃষিজমির উপরেও পড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে বাসযোগ্য ভূমির স্থান সীমিত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। মানুষ বাড়তি জনসংখ্যার সামাল দিতে বনাঞ্চলের উপরে আঘাত হানতে শুরু করেছে। বনের গাছ কেটে বসতি গড়ে তুলছে। কৃষিজমির উপরে বসতি গড়ে তুলছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, যা সুন্দরবনের ক্ষেত্রে একেবারে মঙ্গলদায়ক নয়। তাই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনসম্পদের উপর নির্ভরশীল পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বন সম্পদের উপরে বাড়তি চাপ পড়ছে। বনের সম্পদ কমে যাচ্ছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বনের এই অবক্ষয় চলতে থাকলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব একসময় বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে নতুন যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা হবে ভয়ঙ্কর বিপদজনক। আর এর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল কয়েক লাখ পেশাজীবী মানুষ ও তাদের পরিবার। এছাড়া এই ক্ষতির প্রভাব পড়বে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

সুন্দরবনের নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা

গত কয়েক শতাব্দীতে সুন্দরবনের নদীর ক্ষেত্রে নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়া। অনেক নদী হারিয়ে গেছে, অর্থাৎ শুকিয়ে গেছে। অনেক নদী তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। কয়েক বছর আগে এমন অনেক নদী ছিল যাদের জলস্রোত ছিল ভয়াল-ভয়ঙ্কর, কিন্তু আজ আর তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। নদীকেন্দ্রিক সুন্দরবনে নদীর এমন অবস্থা সুন্দরবনের পক্ষে একেবারে সুখদায়ক নয়। নদী মরে যাওয়ার ফল কি হতে পারে তার প্রমাণ আমরা অদ্বৈত মল্লবর্মণের *'তিতাস একটি নদীর নাম'* উপন্যাসের মধ্যে পেয়েছি। নদী মজে যাওয়ার ফলে শুধু যে সুন্দরবন বিপন্ন তা নয়, সুন্দরবনের সাথে সাথে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জলনিকাশি ব্যবস্থা বিপদের সম্মুখীন। কারণ বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত জল আর তাড়াতাড়ি নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত এলাকা জলমগ্ন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে।[৬০] নদীর গভীরতা কমে গিয়ে শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে নদীর উপরে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। এই ভাবে এক এক করে সমস্ত নদী যদি বিলীন হতে শুরু করে তাহলে সুন্দরবনসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে পড়বে। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।[৪১] জলদূষণ সুন্দরবনের ক্ষেত্রে নানা ভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে এই দূষণের জন্য শুধুমাত্র সুন্দরবনবাসী দায়ী নয়। এই দূষণের জন্য সারা ভারতের মানুষ কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত। কারণ সুন্দরবনের নদীর দ্বারা ভাগীরথী, হুগলী, ইছামতী, কালিন্দী, মাতলা প্রভৃতির নদী প্রবাহ পরিচালিত

হয়। ফলে বাইরে সৃষ্টি হওয়া দূষণের ফলও সুন্দরবনকে ভুগতে হয়, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌর সভার বর্জ্য পদার্থ এই জলে এসে পড়ে। যেমন হুগলী নদী এবং ওই নদীপথে ওই বর্জ্য পদার্থ সুন্দরবনের দূষণ সৃষ্টি করছে।[৬২]

সারা বিশ্বের কাছে রহস্যময় স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ এই সুন্দরবন। এছাড়া জীববৈচিত্র ও সুন্দরতার টানে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ সুন্দরবনে ছুটে আসে। এই কারণে পর্যটন শিল্পের মানোন্নয়ন ঘটছে। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফলেও দূষণের মাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ যে প্রচুর পরিমাণ মানুষ সুন্দরবনের আসছে তাদের সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য প্রতি শীতের সময় হাজার হাজার মোটরচালিত বোট, লঞ্চ, প্রভৃতি সুন্দরবনের নদীর উপরে ঘোরাফেরা করে, যার ফলে নদীর স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এছাড়া ঘুরতে আসা পর্যটকদের ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থের ফলে নদী গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা সুন্দরবনের নদী দূষণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য হয়।[৬৩] সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের অস্তিত্ব বর্তমানে নানা কারণে সংকটজনক পর্যায়ে। জীববৈচিত্রের ধ্বংস, জলবায়ুর পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, দূষণ, জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সুন্দরবন ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে পা বাড়াচ্ছে। ভারতীয় জীববৈচিত্রের প্রধান স্তম্ভ সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে গেলে তার প্রভাবে সারা দেশ ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে সকলের সচেতনতা ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আর তা যদি না করি তাহলে সুন্দরবনের সাথে সাথে সমস্ত দেশের সংকট আসন্ন। যার থেকে কারও মুক্তি নেই।

পরিবেশের উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন তথা সুন্দরবনে সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক বনায়ন কথাটি সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কৃষি কমিশনে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রতিবেদন দ্বারা প্রথম সামাজিক বনায়নের সাথে সকলের পরিচয় ঘটেছিল। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, "One of the principle objectives of social forestry is to make it possible to meet the needs (for forest products for rural people) in full from readily accessible areas, and thereby lighten the burden on (industrial) production forestry"।[৬৪] ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যে সুন্দরবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন শুরু হয়েছিল। সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা বা সৃষ্টির কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বনসম্পদ ধ্বংসের মুখে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীর বনাঞ্চল ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাই বনসম্পদ ও বনাঞ্চল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সামাজিক বনায়নের সূত্রপাত। Gregersen et al, 1989, Wiersum, 1990, Peluso et al, 1994, প্রমুখ লেখকরা সামাজিক বনায়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ন মতামত প্রদান করেছেন। এদের মতে, "সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থাপনার সাথে স্থানীয় মানুষদের ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণ থাকবে,এবং স্থানীয় মানুষের উপরে দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে। এই বনায়নের থেকে ঐ স্থানীয় মানুষরা যাতে সরাসরি সুবিধা ভোগ করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করতে হবে"।[৬৫]

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসে সামাজিক বনায়ন কতটা গুরুত্বপূর্ন বা কি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুন্দরবনে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কার্যকলাপ পরিচালনা করা দরকার সেই বিষয়ে আলোচনা করা আমার মূল উদ্দেশ্য। সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ

সামুদ্রিক ভূখণ্ড। এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবনধারণ করে। অথচ এই সম্পদ চিরস্থায়ী নয়। কারণ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানী, পশুখাদ্য, কাঠের চাহিদা, ইত্যাদির চাহিদা পূরণের জন্য সুন্দরবনের সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এই চাপের কারণে সুন্দরবনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এই অতিরিক্ত চাপ কমানোর কৌশল হিসাবে সামাজিক বনায়নের মতো নতুন একটা চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে।[৬৬] অর্থাৎ সামাজিক বনায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রমহ্রাসমান বনসম্পদের রক্ষা করে বনাঞ্চলের গাছপালা বৃদ্ধি করা এবং বন নির্ভর জনসাধারণের বনসম্পদের চাহিদা পূরণ করা। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে বনায়নের প্রসারণ তিনটি পর্যায়ে হয়েছিল। সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বনায়ন কতটা প্রয়োজনীয় এবং সামাজিক বনায়নের ফলে সুন্দরবন কিভাবে উপকৃত হতে পারে এটাই আমার বিচার্য বিষয়। সামাজিক বনায়নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বা প্রয়োজনীয়তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। আমরা জানি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পদের কোন বিকল্প নেই, সে বৃক্ষ প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হোক বা সামাজিক বনসৃজনের দ্বারা। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনসম্পদের প্রসার খুবই কার্যকরী একটা দিক।[৬৭] সামাজিক বনায়নের দ্বারা সুন্দরবনবাসী তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণে করতে পারবে। ফলে তাদের আর বনে যেতে হবে না। যেমন- জ্বালানী, পশুখাদ্য, ছোট ছোট কাঠ, বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম বা কাঠামো। সামাজিক বনায়নে গাছ রাস্তার দুই ধারে, ফাকা পড়ে থাকা জমিতে, নদীর ধারে লাগানোর ফলে ঐ সমস্ত জায়গার মাটির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাই, তাই খুব সহজে মাটি ধসে পড়ে যায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক বনায়ন সুন্দরবনে খুবই আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই সামাজিক বনায়নের উন্নয়ন মানে সুন্দরবনের পরিবেশের উন্নয়ন। সুন্দরবনের এই বনায়নের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ও প্রশাসনিক দিক থেকে নানা ধরণের প্রকল্প রুপায়ন হচ্ছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে- রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের প্রতিটা গ্রামে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের অঞ্চলের দ্বারা পরিচালিত হয় এই বৃক্ষ রোপণ। এছাড়া প্রতিটা স্কুল থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের গাছের চারা বিতরন করা হচ্ছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা থেকেও গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবনের পরিবেশে সামাজিক বনায়ন নিজস্ব একটা পরিচিতি বানিয়ে নিয়েছে, যার দ্বারা সুন্দরবনের পরিবেশের সাথে সাথে সমগ্র সুন্দরবনবাসী গভীরভাবে উপকৃত হচ্ছে। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে গ্রামের নিম্ন আয়ের লোকদের বিকল্প কাজের মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় রোধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ দ্বারা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ চুরির প্রবনতা বন্ধ করাও সুন্দরবনের সামাজিক বনায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।[৬৮]

সুন্দরবনের সামাজিক বনায়ন কোন পদ্ধতিতে এবং কেমন ভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা খুবই প্রয়োজনীয়। সুন্দরবনের বনায়ন তিনটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ক) সারিবদ্ধ বনায়ন, খ) ম্যানগ্রোভ বনায়ন, গ) বাগিচা বনায়ন।

সারিবদ্ধ বনায়ন বলতে সাধারনত পাকা রাস্তা, ইটপাতা রাস্তা, মাটির রাস্তা, পুকুর পাড়, সেচ খালের দুই ধার এবং কৃষিজমির আলের উপরে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানোকে বোঝান হয়েছে। সারিবদ্ধ বনায়নে যে সমস্ত গাছ লাগানো হয়ে থেকে সেগুলো হল-

বাবলা, আকাশমণি, ঝাউ, শিশু, সুবাবুল, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি। এই সমস্ত গাছের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ১৯৮১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই পদ্ধতির দ্বারা কত পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছিল তার একটা পরিসংখ্যান-[৬৯]

বছর	কিলোমিটার হিসাবে পরিমাণ
১৯৮১-৮২	-
১৯৮২-৮৩	২০০ কি.মি
১৯৮৩-৮৪	২৪৩ কি.মি
১৯৮৪-৮৫	৩৫০ কি.মি
১৯৮৫-৮৬	৯০০ কি.মি
১৯৮৬-৮৭	৫২২ কি.মি
১৯৮৭-৮৮	১৭৫ কি.মি
১৯৮৮-৮৯	১০০ কি.মি
১৯৮৯-৯০	৫৯ কি.মি

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমপর্বে সামাজিক বনায়ন তেমন ভাবে কার্যকরী না হলেও ধীরে ধীরে সামাজিক বনায়ন সুন্দরবনের উন্নয়নের প্রধান অংশীদারে পরিণত হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে এই প্রকল্পে সবথেকে বেশি গাছ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৯-৯০ সালে এই গাছ লাগানোর অগ্রগতির হার একদম কমে গিয়েছিল। এর কারণ হিসাবে গাছ লাগানোর উপযুক্ত জমির অভাবের কথা বলা যায়।

সুন্দরবনের মূল বৈশিষ্ট্য বা চালিকা শক্তি হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। কিন্তু আমরা যদি সুন্দরবনের বসতির ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো বসতি স্থাপনের সময় অবৈজ্ঞানিক ভাবে গাছ কাটা হয়েছিল। ফলে সুন্দরবনের ইতিহাসে ধীরে ধীরে ভূমিক্ষয় ও

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। ভূমিক্ষয় সুন্দরবনের নদীবাঁধের বিপর্যয়ের সাথে সাথে কৃষির উপরেও দারুণ প্রভাব ফেলেছে। সুতরাং এই সমস্ত সঙ্কটের থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে ম্যানগ্রোভ বয়ানয়ের লখ্যমাত্রা নেওয়া শুরু করেছিল সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের দ্বারা লাগানো গাছের একটা পরিসংখ্যান-[৭০]

বছর	কিলোমিটার হিসাবে পরিমাণ
১৯৮২-৮৩	২০ কি.মি
১৯৮৩-৮৪	৫০ কি.মি
১৯৮৪-৮৫	৭৫ কি.মি
১৯৮৫-৮৬	১০০ কি.মি
১৯৮৬-৮৭	২২৪ কি.মি
১৯৮৭-৮৮	৩৮ কি.মি
১৯৮৮-৮৯	৬০ কি.মি
১৯৮৯-৯০	১০৩ কি.মি
১৯৯০-৯১	১৫৫ কি.মি

নদীবাঁধের ভাঙন রোধ ও জ্বালানী কাঠের জোগান অব্যহত রাখার উদ্দেশ্যকে পাথেয় করে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এই প্রকল্পের সূচনা করেছিল। পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার এই উদ্দেশ্য দারুণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রকল্পে যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানো হয়- বাইন, কেওড়া, সুন্দরী, গর্জন, পশুর, ধুন্দুল ইত্যাদি।

সারিবদ্ধ বনায়ন ও ম্যানগ্রোভ বনায়ন ছাড়াও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবন অঞ্চলে বাগিচা বনায়ন বা খামার বনায়ন নামের আরও একটি প্রকল্পের শুরু করেছিলেন।

সারিবদ্ধ বনায়ন এবং ম্যানগ্রোভ বনায়নের সফলতার ফলে সুন্দরবনবাসীর নিজেদের বাস্তুজমিতে গাছ লাগানোর উৎসাহ দেখেই এই প্রকল্পের সূত্রপাত। সুন্দরবনবাসীর উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্পের কাজ নিজেদের হাতে নেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন।[৫৩] এই প্রকল্পে সুন্দরবনবাসীদের বিনামূল্যে ইউক্যালিপটাস, শিশু, মেহগনি, ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া, মহানিম, আকাশমণি, সুবাবুল, কাজুবাদাম ইত্যাদি গাছের চারা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসের অনুরোধে লেবু, আম, সবেদা, নারকেল প্রভৃতি ফলের চারা বিতরন করা হত। এই বনায়ন প্রকল্পের দ্বারা সুন্দরবনের চাষিরা নিজেদের জমিতে নিজের মত করে গাছ লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করার সাথে সাথে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো এবং প্রয়োজনীয় জ্বালানির ব্যবস্থা করায় ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।[৭১]

সুন্দরবনে বাগিচা বনায়ন কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার একটা পরিসংখ্যন দিলে বুঝতে সুবিধা হবে-[৭২]

বছর	কিলোমিটার হিসাবে পরিমাণ
১৯৮২-৮৩	৮১ কি.মি
১৯৮৩-৮৪	২৪০ কি.মি
১৯৮৪-৮৫	১৫০ কি.মি
১৯৮৫-৮৬	১২৫ কি.মি
১৯৮৬-৮৭	৪০০ কি.মি
১৯৮৭-৮৮	৬১৯ কি.মি
১৯৮৮-৮৯	৭৩৯ কি.মি
১৯৮৯-৯০	৬৯৮ কি.মি।

সুন্দরবনের গ্রামস্তরে বাগিচা বনায়ন সবথেকে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই সঙ্গে গাছের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার পরিসংখ্যান অন্য প্রকল্পের থেকে বাগিচা বনায়নে যথেষ্ট বেশি বা সন্তোষজনক। এই বনায়নের ফলে জ্বালানী কাঠ, গৃহ নির্মাণ কাঠ, আসবাবপত্র নির্মাণ কাঠের জোগান অনেক গুন বেড়ে গিয়েছিল।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবনের সামাজিক বনায়নে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছিল তাঁর একটা হিসাব নিচে দিলাম।[৭৩]

বছর	মোট ব্যয়
১৯৮১-৮২	৮০ হাজার টাকা
১৯৮২-৮৩	৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
১৯৮৩-৮৪	১৬ লক্ষ, ৯৫ হাজার টাকা
১৯৮৪-৮৫	১৯ লক্ষ, ১৬ হাজার টাকা
১৯৮৫-৮৬	৫৫ লক্ষ টাকা
১৯৮৬-৮৭	৮ লক্ষ, ১০ হাজার টাকা
১৯৮৭-৮৮	১৮ লক্ষ, ৩৯ হাজার টাকা
১৯৮৮-৮৯	২৩ লক্ষ, ১৪ হাজার টাকা
১৯৮৯-৯০	৩২ লক্ষ, ৯০ হাজার টাকা
১৯৯০-৯১	১২ লক্ষ, ৯৫ হাজার টাকা।

এখন প্রশ্ন হল এই সামাজিক বনায়নের সফলতা কতটা? এর উত্তরে বলা যায় সুন্দরবনের ইতিহাসে সামাজিক বনায়ন দারুণ ভাবে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ ভূ-প্রকৃতিক অবস্থানের কারণে সুন্দরবন ভারতের সবথেকে পিছিয়ে পড়া একটি ভূখণ্ড। এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। এমন অবস্থায় এই প্রকল্পের দ্বারা

সুন্দরবনবাসী গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রতি আস্থাশীল হয়েছিল। সুন্দরবনবাসী এই প্রকল্পের দ্বারা কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেয়েছিল। মহিলারা এই প্রকল্পে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন মহিলা সমিতিতে মহিলারা বীজ থেকে চারা তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

সুন্দরবনের সামাজিক বনায়নের ফলে নদীবাঁধের ভাঙন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। বনায়ন সবসময় পরিবেশের জন্য মঙ্গলদায়ক। এই বনায়নের ফলে সংরক্ষিত বনের থেকে মানুষের নির্ভরতা অনেকটা কমানো সম্ভব হয়েছে। বেআইনি অনুপ্রবেশ ও চোরা চালান অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে। তাই সমস্ত কিছুর বিশেষণ করে বলা যায় সামাজিক বনায়ন দারুণ ভাবে সফল সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসে। সুন্দরবনের মূল সম্পদের বাইরে সামাজিক বনায়নের দ্বারা নতুন সম্পদের সৃষ্টি সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এই লক্ষ্যে উন্নয়ন দপ্তর যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলি হল- ক) ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য নদীর চরভুমিতে বাদাবন সৃষ্টি করা। খ) নদীর ঢেউ ও স্রোতের ফলে বাঁধের ক্ষয় রোধ করার জন্য নদীর দিকের বাঁধের ধার ধরে সারিবদ্ধ বনায়ন সৃষ্টি করা। গ) ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে সুন্দরবনের সম্পদ ও সুন্দরবনবাসীর রক্ষার জন্য নদীবাঁধের ভিতরের পাড়ে বনায়নের বলয় বা বৃক্ষের বেষ্টনী তৈরি করা।[৭৪] অর্থাৎ সুন্দরবনের সামাজিক বনায়ন সুন্দরবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি আলোক বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যা সুন্দরবনের প্রসারকে আরও গতিদান করেছে।

তথ্যসূত্র

১. লোক সংস্কৃতি গবেষণা, 'লৌকিক জলযান', বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৩

২. প্রনব সরকার, স্বদেশ চর্চা লোক, "সেকালের পথঘাত-১", কলকাতা, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১১৩

৩. বৈদ্যুতিন মাধ্যম: https://www.ebookbou.edu.bd, Retrieved on 20.10.21

৪. মত্তদুদুর রহমান, জীবন জীবিকা ও জীব বৈচিত্রের ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন (খুলনা-বাংলাদেশ: সেন্টার ফর কোষ্টাল এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন, ২০১৫), পৃ- ২৮

৫. রহমান, হৃদয় মামুনূর, *Joy News 24. Com*, Sunday, 13 Dec, 2020

৬. Amit Bhattacharyya and Mahua Sarkar, eds. History and the Changing Horizon Science, Environment and Social Systems (Kolkata, Setu Prakashani, 2014), p-115; এছাড়াও দ্রষ্টব্য; বৈদ্যুতিন মাধ্যম: https://www.ebookbou.edu.bd, Retrieved on 20.10.21

৭. বিমলেন্দু হালদার, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবনের সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি" নবম সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৪৫

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৯. ক্ষেত্র সমীক্ষা, নাম- ভরত চন্দ্র মণ্ডল, থানা- গোসাবা, গ্রাম- বিজয় নগর, বয়স- ৪৬, পেশা- সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারী, তারিখ- ২২,১১,২০১৮ সময়- দুপুর ১.৩০ মিনিট

১০. ধূর্জটি নস্কর, সুন্দরবন সভ্যতার ইতিহাস (কলকাতা: সুন্দরবনের ইতিহাস, ২০০০), পৃ- ৬৪

১১. জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "সুন্দরবনের নদীবাঁ", ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ অক্টোবর ২০১৭ ও ১৫ জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৫৮

১২. অনুকূল মণ্ডল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (কলকাতা: দেশী বুক এজেন্সি, ২০১৮), পৃ- ৮৮

১৩. মোহিত রায়, পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৫), পৃ- ৩৫৪

১৪. তদেব,

১৫. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৪৪

১৬. মোহিত রায়, পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৫), পৃ- ৩৫৪

১৭. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৪৪

১৮. তদেব, পৃ- ৪০

১৯. The Constitution of India, Article 48A, Government of India, Ministry Of Law and Justice, New Delhi, 2005, p-19

২০. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৫

২১. J Razzaque, "Case Law Analysis: Application of Public Trust Doctrine in Indian Environmental Cases" (2001), 13(2) Journal of Environmental Law 231

২২. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ২

২৩. Lal's commentaries on Water and Air Pollution and Environment (protection) Laws, 4th edition, revised by mc Mehta, Delhi Law House, 2000, p- 916

২৪. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (As modified upto 1st November, 1990), Government of India, Minisitry of Law and Justice, P-1, এছাড়াও দ্রষ্টব্য; ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৭৮

২৫. Lal's commentaries on water and Air Pollution and Environment (protection) Laws, 4th edition, revised by mc Mehta, Delhi Law House, 2000, p-362; এছাড়াও দ্রষ্টব্য; ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৭৮

২৬. Tenth Five Year Plan, 2002-2007, Volume-II, Planning Commission, Government of India, New Delhi, Chapter 9: Forests and Environment, p-1055

২৭. Tenth Five Year Plan, 2002-2007, Volume-I, Inclusive Growth, Planning Commission, Government of India, New Delhi, Chapter-9, Environment and Climate Change, p-191

২৮. B, Dutta, 'West Bengal Panchayat Manual', Kamal Law house, 2003, pp-42-45.

২৯. S.K. Mitra, Handbook on the Kolkata Municipal Corporation Act, *1980*, Venus, 2002, p. 27

৩০. গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের পরিণতি ভেবে উদ্বিগ্ন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা, আনন্দবাজার পত্রিকা, লন্ডন, ১ ডিসেম্বর, ২০১২।

৩১. LN Datta, The West Bengal Municipal Act, 1993, Tax 'N Law, Kolkata, p.46 এছাড়াও দ্রষ্টব্য; ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৮

৩২, মোহিত রায়, পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৫), পৃ- ১৬৫

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৬

৩৪. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ১০৬

৩৫. Ram kumar Bharkat, 'Chipko Protests', The Statesman, 6 November, 2002, p. 6

৩৬. Sundarban Fertilizers Limited: Prospects & Project Profile (For Private Circulation Only).

৩৭. Biswajit Mukherjee & Rahul Ray, Environmental Awakening (Kolkata, Sikha Books, 2005), p-181.

৩৮. Letter to Minister-in-Charge, Department of Forest & Environment, Government of W.B, p-5.

৩৯. Biswajit Mukherjee & Rahul Ray, Environmental Awakening (Kolkata, Sikha Books, 2005), p-183.

৪০. তদেব, পৃ- ১৮২

৪১. তদেব, পৃ- ১৮৩

৪২. Environmental Awareness: Context- The Proposed Fertilizer Company at Sundarban, Calcutta, 1987, p-9.

৪৩. Mukherjee, Biswajit, & Ray, Rahul, '*Environmental Awakening'*, Sikha Books, Kolkata, 2005, p-185.

৪৪. তদেব্, পৃষ্ঠা- ১৮৫।

৪৫. Mahim Pratap Singh, 'Chronic toxicity in Carbide soil', Ground Water: CSE, The Hindu, December 3, 2009, p. 5

৪৬. বৈদ্যুতিন মাধ্যম: https://kccollege.ac.in, Retrieved on 26.02.21

৪৭. ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০), পৃ- ৯৩

৪৮. তদেব, পৃ- ১০২

৪৯. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০০৮), পৃ- ১৩৮

৫০. মনোজ কুমার সাহা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০), পৃ- ২০৬

৫১. তুষার কাঞ্জিলাল, পথে-প্রান্তরে (কলকাতা: প্রজন্ম প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ- ৩৪

৫২. মনোজ কুমার সাহা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০), পৃ- ১৯৩

৫৩. ক্ষেত্রসমিক্ষা, আধিকারিক, সেচ দপ্তর, গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭জুন, ২০২১, সময়- দুপুর ১২.৩০ মিনিট

৫৪. মনোজ কুমার সাহা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০), পৃ- ১৯৩

৫৫. জয়দেব দাস এবং অমল নায়েক, অজানা সুন্দরবন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: চম্পা মহিলা সোসাইটি, ২০১৫), পৃ- ১২

৫৬. বিমলেন্দু হালদার, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-১", কলকাতা, ২০০৭, পৃ- ৫১

৫৭. শঙ্কর কুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন-জল-জঙ্গল-জীবন (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৪ এপ্রিল ২০০৮), পৃ- ৫৫

৫৮. জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী, সুন্দরবনের অনধিকার চর্চা (কলকাতা: রংরুট হলিডেইয়ার, ২০১৫), পৃ- ৫৬

৫৯. সন্তোষ বর্মণ, সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (কলকাতা: ২০১০) পৃ- ৫৬

৬০. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০০৮), পৃ- ২০৭

৬১. বিমলেন্দু হালদার, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা- ৬", কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ২

৬২. মনোজ কুমার সাহা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬ (কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০), পৃ-২০০

৬৩. ক্ষেত্র সমীক্ষা, মাধব সাশমল, গ্রাম- পাঠানখালী, থানা- গোসাবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বয়স- ৩৫, পেশা- বোট চালক

৬৪. Arnold, J.E.M, Community forestry, ten years in review (Rome, Italy: FAO, 1991), p- 31

৬৫. K.F. Wiersum, Social Forestry: Changing Perspectives in Forestry Science or Practice? (Netherlands: Wageningen Agricultural University, 1999), p- 211

৬৬. Vikas Kumar, Social Forestry in India: Concept and Schemes, Vol.2 (Madhya Pradesh: Tropical Forest research Institute, 2015) p-18

৬৭. বৈদ্যুতিন মাধ্যম: https://www.ebookbou.edu.bd, Retrieved on 26.02.21

৬৮. "সুন্দরবন উন্নয়নে সামাজিক বনসৃজনের ভূমিকা", সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬৯. সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৭০. "সুন্দরবন উন্নয়নে সামাজিক বনসৃজনের ভূমিকা", সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৭১. Vikas Kumar, Social Forestry in India: Concept and Schemes, Vol.2 (Madhya Pradesh: Tropical Forest research Institute, 2015) p- 21

৭২. "সুন্দরবন উন্নয়নে সামাজিক বনসৃজনের ভূমিকা", সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৭৩. তদেব,

৭৪. সত্যানন্দ দাস, "সুন্দরবন সংরক্ষণ", বনাধিকারিক, সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ।

তৃতীয় অধ্যায়

সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও কার্যকলাপ

সুন্দরবনের সামগ্রিক গ্রাম উন্নয়নে সরকারি অবদান অনস্বীকার্য। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে এই এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমার আলোচ্য বিষয় হল সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার ছাড়াও আর কোন কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও সংগঠন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সুন্দরবনের অগ্রগতির উন্নয়নে ওই সমস্ত সংস্থা বা গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা ও কার্যকলাপ কতটা গতি প্রদান করেছে সেটাই বিশ্লেষণ করা। আলোচ্য অধ্যায়ে আমি সুন্দরবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এই সংস্থাগুলো সুন্দরবনের সর্বস্তরের উন্নয়নে কেমন ভাবে কাজ করছে। সংস্থা দুটি হল- ক) টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট খ) জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। বিশেষ করে এই এলাকার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কারণ সুন্দরবনের যে কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নে এই বিষয়ে সঠিক তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে সুন্দরবনবাসীর পেশা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা খুবই দরকারি। সুতরাং আলোচ্য অধ্যায়ে এই দুটি সংস্থার মাধ্যমে সুন্দরবনের এমন অনেক অজানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টঃ

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ‘টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট’ নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যার সভাপতি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সম্পাদক ছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যাতে এই সংস্থার কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি প্রকল্প ছিল যথা- ১. বোলপুর প্রকল্প ২. রাজনগর খয়রাসোল প্রকল্প ৩. তপন প্রকল্প ৪. রাঙ্গাবেলিয়া প্রকল্প ৫. সাগর প্রকল্প ৬. হিঙ্গলগঞ্জ প্রকল্প। উড়িষ্যাতে তিনটি প্রকল্প ছিল যথা- ১. ফিরিঙ্গিয়া প্রকল্প ২. মালকানগিরি প্রকল্প ৩. হিন্দল প্রকল্প। ঝাড়খণ্ডে দুটি প্রকল্প যথা- ১. মহেশপুর প্রকল্প, ২. পটমদা প্রকল্প ছিল। সুন্দরবনের প্রেক্ষিতে যেহেতু রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টটা কেমন ভাবে তৈরি হয়েছিল সেটা একটু বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত। ১৯৭৪ সালে ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে পান্নালাল দাশগুপ্ত রাঙ্গাবেলিয়ার পাশের গ্রাম মন্মথনগরে সরকারি জেলা বীজ খামার পরিদর্শনে এসেছিলেন। ওই খবর পাওয়া মাত্র সুন্দরবনের প্রাণপুরুষ ও উন্নয়নের রূপকার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই তুষার কাঞ্জিলাল সুন্দরবনের মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে সুন্দরবনের রাঙ্গাবেলিয়ায় টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট তাদের একটি শাখা খোলে এবং দায়িত্বভার দেন মাস্টার মশাই তুষার কাঞ্জিলাল মহাশয়কে।[১] সুন্দরবনের মানুষকে প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। এই অঞ্চলের জীবিকা নির্বাহের পরিকাঠামো সেই অর্থে গড়ে ওঠেনি। জীবিকা নির্বাহের জন্য ৯০ শতাংশ পরিবার কৃষির

উপরে নির্ভর করে। তাই রাঙ্গাবেলিয়া প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ছিল সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।[২] কৃষিকাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- বর্ষার ধান চাষ, শীতের সময় লঙ্কা, কুমড়ো, উচ্ছে, তরমুজ, সূর্যমুখী তেল, মুগ ডাল, তিল ইত্যাদি। রাঙ্গাবেলিয়া প্রকল্প তাদের সংগঠন ও উন্নয়নের কাজ দুটি পদ্ধতির দ্বারা শুরু করা হয়েছিল- ক) পাড়া কমিটি, খ) গ্রাম কমিটি। প্রথম স্তরে কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় 'পাড়া কমিটি'। পাড়া কমিটির মূল দায়িত্ব পরিবার ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা। দ্বিতীয় স্তরে পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'গ্রাম কমিটি'। প্রকল্প রূপায়ণে গ্রাম কমিটি গুলো দায়বদ্ধ ছিল, এছাড়া প্রকল্প রূপায়ণে যে কোন ধরণের সমস্যার সমাধান করার দায়িত্বও গ্রাম কমিটির উপর ছিল। তাই তৎকালীন সময়ে একটা স্লোগান ভেসে উঠেছিল-"গ্রামের পরিকল্পনা করবে কারা, গ্রামের মানুষ আবার কারা"। এক বছরের পরিসংখ্যান দিয়ে গ্রাম কমিটি ও গ্রাম সভার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যেতে পারে।[৩]

মিটিং	মিটিং সংখ্যা	উপকৃত মানুষের সংখ্যা
পাড়া মিটিং	২৯৮	৬০১০ জন
নদীবাঁধ সংক্রান্ত মিটিং	১৪	৭৩০ জন
অধিকার সংক্রান্ত মিটিং	১১	৫৪২ জন
সুন্দরবন ও পরিবেশ সংক্রান্ত মিটিং	১৭	১৮১০ জন
বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক মিটিং	১৪	৭৩৯ জন
ক্লাব সদস্যদের নিয়ে মিটিং	৩০	১০৮২ জন
কিশোর কিশোরীদের নিয়ে মিটিং	৩১	৯৯৮ জন
দিবস উদযাপনের মিটিং	১৫	১৮৬০ জন
গ্রাম সংগঠকদের মিটিং	২৪	১৯ জন

Annual Report of Tagore Society for Rural Development 2009.

১৯৭৫ সালে রাঙ্গাবেলিয়া, পাখিরালয় এবং জটিরামপুর এই তিনটি গ্রামকে নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। এই এলাকা তিনটের উন্নয়ন দেখে ক্রমাগত এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ১৯৮০ সালের মধ্যে আরও ৩৩টি গ্রামে এই প্রকল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৮৮ সালের ২৯শে নভেম্বর সুন্দরবনে ২৫০ কিমি বেগে যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। ওই ঝড়ে সুন্দরবনের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, ওই সংকটজনক অবস্থায় এই সংস্থা সর্বদা সুন্দরবনবাসীর পাশে থাকার চেষ্টা করেছিল। সংস্থাটির প্রসারে এই মানবিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারপর ১৯৮৯ সালে আরও ৭২টি গ্রাম, ১৯৯৮ সালে ২৪৭টি গ্রাম, ২০০১ সালে ৩১৪টি গ্রামে রাঙ্গাবেলিয়া প্রকল্পটি বিস্তারলাভ করে। এরপর সাগর ও হিঙ্গলগঞ্জ প্রকল্প দুটি সরাসরি টেগোর সোসাইটির সাথে যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে কাজ শুরু করেছিল।[৪]

রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের কার্যকলাপঃ

সুন্দরবনের সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের দ্বারা যে সমস্ত বিভাগীয় পরিষেবা শুরু হয়েছিল সেগুলি হল- ১) কৃষি- ১৯৭৫ ২) মহিলা সমিতি- ১৯৭৬ ৩) সংস্কৃতি সংসদ- ১৯৭৮ ৪) সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্প- ১৯৭৮ ৫) শিক্ষা- ১৯৭৯ ৬) প্রাণী সম্পদ- ১৯৮৪ ৭) কনস্ট্রাকশন (কাপার্ট)- ১৯৮৬ ৮) রিলিফ ইউনিট- ১৯৮৮ ৯) স্যানিটারী মার্ট- ১৯৯৩ ১০) মাটি পরীক্ষাগার- ১৯৯৩ ১১) সবুজায়ন/ গ্রীনিং ইন্ডিয়া- ১৯৯২/১৯৯৫ ১২) আর.সি.এইচ- ১৯৯৯ ১৩) মেডিসিনাল প্লান্ট- ২০০৭ ১৪) বাদাবন সংরক্ষণ ও জীবিকা সহায়ক- ২০০৭ ১৫) টি.সি.এস.আর.ডি- ২০১১ ১৬) ইকারডা নতুন দিল্লী(খেসারী চাষ)- ২০১২।[৫] এই সমস্ত বিভাগীয় পরিষেবাকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট কেমন ভাবে

সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে নিজেদের স্থানকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল সেটার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কৃষি উন্নয়ন (১৯৭৫)

সুন্দরবনবাসীর মূল সমস্যা ছিল দরিদ্রজনিত ক্ষুধা। তাই এই প্রকল্পের সূচনা খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে হয়েছিল বলা যায়। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নয়ন ঘটিয়ে খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা। গরীব মানুষদের বন্ধকী জমি ছাড়িয়ে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় সেটাই ব্যবস্থা করাই ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা ছিল - মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সেচের জলের অভাব, ভালো বীজের অভাব, পরিকাঠামোর দুর্বলতা, কৃষকদের সম্পদের অভাব, প্রযুক্তিহীনতা ইত্যাদি। এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে, এক ফসলী জমিকে কিভাবে দোফসলীতে পরিণত করা সম্ভব এবং কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় সেই লক্ষ্যে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যেমন - ১. কৃষি বিষয়ক সচেতনতা সভা, অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের মানুষকে সারিবদ্ধ করে কৃষি বিষয়ে সচেতন করা হয় ২. কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ৩. মাটি পরীক্ষা করা ৪. অ্যাগ্রো সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে কৃষকদের যন্ত্রপাতি যেমন- ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট, স্প্রে-মেশিন, ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে উপযুক্ত করে তোলা এবং উন্নত বীজ, সার কীটনাশক ইত্যাদির বিতরণ। এছাড়াও পরিকল্পনা মাফিক চাষিদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা এবং ফসল উৎপাদনের পর ওই ঋণ কিভাবে পরিশোধ করা হবে তার ব্যবস্থা করা ৫. বীজ উৎপাদনকে সংরক্ষিত করা এবং

জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার ৬. যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শস্যের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ৭. কীচেন গার্ডেন ৮. এফ.এল.ডি প্রদর্শন মূলক চাষ ৯. নোনা সহনশীল বীজ সংরক্ষণ ১০. মডেল ফার্মার গড়ে তোলা ১১. জিরো টিলেজ মেশিনের মাধ্যমে চাষ ইত্যাদি।[৬]

কৃষি উন্নয়ন বিভাগের উপরিউক্ত পদক্ষেপের ফলে সুন্দরবনের কৃষি ক্ষেত্রে যে সফলতা এসেছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, তাই নীচে এই কাজের সাফল্য সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম।

১. কৃষি সচেতনী সভা- ২০০টি, অর্থাৎ কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে সভার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়েছিল, যার ফলে সকলের মধ্যে কৃষিকাজ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়েছিল।

২. লঙ্কা, তরমুজ, মুগডাল ও খেসারী ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষে ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ।

৩. তালমুন্ডর, নোনাবোগড়া, সাদা গেঁতু, লাল গেঁতু, রূপশাল, ঝিঙেশাল, দুধেশ্বর, মালাবতী, কর্পূর কান্তি ইত্যাদি নোনা সহনশীল ধান বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এছাড়া আরও অন্যান্য দেশি ধানের বীজকেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৪. এফ.এল.ডি প্রোগ্রামে রণজিৎ, প্রতীক্ষা, জারাভা, ভরষা ও স্বর্ণ সাব ওয়ান ধান চাষে সাফল্য। তিনটি জিরো টিলেজ মেসিনের মাধ্যমে ২০০৭ সাল থেকে ৪৬০ বিঘা ধান চাষ ও ৪৯০ বিঘা গম চাষে সফলতা অর্জন। ৫০০ টন ধানবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সংশীতকরণ।

৫. চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন নতুন ধান কিভাবে সুন্দরবনের পরিবেশে চাষ করা সম্ভব হবে তার ব্যবস্থা করে সেই নতুন ধানের চাষ করা আরম্ভ হল।

৬. পশ্চিমবঙ্গ উপকৃষি অধিকর্তা বিভাগের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুদানে ধান বীজ এবং অন্যান্য বীজ প্রসেসিং-এর জন্য মেশিন ও বীজ পরীক্ষার জন্য যন্ত্র কেনা হয়েছে। ২০০৯ সালে রবি চাষ ৩.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে।[৭]

মহিলা সমিতি (১৯৭৬)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে সুন্দরবনের মেয়েদের সংখ্যা অর্ধেকের কাছাকাছি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা সমিতির উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। মহিলাদের আত্মনির্ভরতা, লিঙ্গ বৈষম্য, পণপ্রথা, বধু নির্যাতন, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়াতা বীণা কাঞ্জিলাল ১৯৭৬ সালে মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন। বীণা কাঞ্জিলাল ছিলেন তুষার কাঞ্জিলালের স্ত্রী। সুন্দরবনের নারী সমাজের মানসিক উন্নয়নের সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়ন ভীষণ ভাবে দরকার ছিল। মেয়েদের অবস্থার উন্নয়নকে সামনে রেখে তিনটি গ্রামের ৩৫জন সদস্যকে নিয়ে রাঙ্গাবেলিয়ার স্কুল ঘরে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ক্রমশ এই সমিতির কর্মধারা প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। বর্তমানে ৮টি ব্লকের ৩০০টি গ্রামে ৬০১১ জন সদস্যকে নিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই মহিলা সমিতির মধ্যে রয়েছে উইমেন্স ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার।[৮]

ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টারে টেলারিং বিভাগে ১২টি সেলাই মেশিন এবং নীটিং সেন্টারে ৯টি মেশিনে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপরেটিভ সোসাইটিতে ২৫টি তাঁত আছে। প্রোডাকশন সেন্টারে মহিলাদের টেলারিং, নীটিং, উইভিং, ব্লক ও বাটিক, প্রিন্টিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। এখানে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৩৫৩ জন মহিলা প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। প্রশিক্ষণ পেয়ে ৪০টি দুঃস্থ পরিবারের ৫২ জন মহিলা সেন্টারে কাজ করে প্রতিমাসে ১২০০ টাকা থেকে ৩০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন করত। প্রোডাকশন সেন্টারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি মহিলা সমিতির তিনটি বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এছাড়া শহরের মেলায় স্টল ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করা হয়।[৯] মহিলা সমিতি নির্দিষ্ট কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপ অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে পরিচালনা করে। পদক্ষেপ গুলি নিম্নরূপ- ১. সর্ব প্রথম এই সমিতির সদস্য হিসাবে যোগদান করতে হবে ২. গ্রামে গ্রামে স্বল্প সঞ্চয়ের দল গঠন করে স্বনির্ভর করতে হবে। ২০১১ সাল পর্যন্ত ২১১টি স্বনির্ভর দল গঠন হয়েছে ৩. দুঃস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনামূলক সভার মাধ্যমে সমাজের সব স্তরের নারীদের সচেতনার বিকাশ ঘটানো হয় ৪. ব্যক্তিগত পরিছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সুন্দরবনের মৌলিক সমস্যার সমাধানের বিষয়ে সচেতন করা হয় ৫. পণপ্রথা, বধু নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দিকেও গুরুত্ব দিয়েছিল ৬. সমাজের মহিলাদের আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও মহিলা সম্মেলন করা।[১০] এমনভাবেই এই সমিতি নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহনের

মাধ্যমে সুন্দরবনের নারীদের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিল এবং বর্তমানেও তাদের কার্যক্রম অব্যাহত।

সংস্কৃতি সংসদ (১৯৭৬)

মানুষের মনে সুস্থ সংস্কৃতির চেতনা ছাড়া সঠিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। চলমান নিয়মের সংস্কৃতি বা শুদ্ধি ঘটিয়ে স্থিতিতে রূপান্তর করাই সংস্কৃতি। যে কোনো সংস্কার বেশীদিন স্থায়ী হয় না, বারে বারে রূপান্তর ঘটতে থাকে। তাই সংস্কৃতি কখনও অপসংস্কৃতি আবার কখনও উন্নয়নের বাহক হিসাবে চলমান। সত্তরের দশকে গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা পর্যায় ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ব্যবস্থা, সবই সংস্কৃতির অংশ। অন্যদিকে আচার-আচরণ, ভোগ, নেশা, বিনোদন প্রভৃতিও সংস্কৃতির অংশ। ১৯৭৬ সালে বীণা কাঞ্জিলাল সামাজিক সংস্কৃতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করে সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল- ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধরে রেখে আধুনিক সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করা এবং অভিনবত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ সচেতন করা। রবীন্দ্র সংগীতের পাশাপাশি সুন্দরবনের ঐতিহ্যশীল টুসু, ঝুমুর, সারুল গান শেখানো শুরু হয়। ধীরে ধীরে গানের কথার মধ্যে সুন্দরবনের বাস্তব জীবনকে তুলে ধরে গান গুলিকে বাস্তববাদী জীবনমুখী করে তুলে ধরা হয়েছিল। গানের সাথে সাথে নৃত্য, সংগীত, গীতিনাট্য, কড়চা, পাঁচালি, তৎকালীন নাটিকা, পথ নাটিকা ইত্যাদিকেও যুক্ত করা হয়েছিল।[১১]

সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতে আয়োজিত সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানে আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, মূকাভিনয়, তরজা, পাঁচালি, কড়চা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমকে আধুনিক সংস্কৃতির মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি জন সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই সংস্কৃতি সংসদের সফলতা হিসাবে ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নাট্য একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা যায়।[১২]

সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্প (১৯৭৮)

একবিংশ দশকে সুন্দরবনের গ্রামগুলোতে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল সব থেকে বেশি। এই জলবাহিত রোগ থেকে মুক্তির পথ হিসাবে গ্রাম সভায় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও পানীয় জলের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পুকুর সংরক্ষণ, জল ফুটিয়ে খাওয়া, বাড়িঘর, বাসনপত্র, পরিষ্কার রাখা, সারের গর্ত ব্যবহার করা, খাবার জিনিস ঢেকে রাখা, দাঁত মাজা, নখ কাটা, হাত ধোয়া, পোশাক পরিষ্কার রাখা ও পরিচ্ছন্নতা মানা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগ হলে চিকিৎসার প্রয়োজন তাই রোগ যাতে কম হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য স্বাস্থ্য আন্দোলন যেমন- স্বাস্থ্য বিধি পালন, টিকাকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ইত্যাদি। ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের পরিধি বাড়তে থাকে এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এই কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ও পরিবেশ পরিছন্নতার ভিত্তিতে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা এবং রোগাক্রান্তদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পরামর্শ প্রদান করা। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনার ভিত্তিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ মাতৃত্ব, মাতৃত্বের স্বাস্থ্য ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এই প্রকল্পের মধ্যে ছিল।[১৩] সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের পদক্ষেপগুলি হল-

১. শয্যা বিশিষ্ট ২৫টি হাসপাতাল নির্মাণ। যার মধ্যে ৫টি ছিল শিশুদের জন্য, এবং ২০টি ছিল জেনারেল হাসপাতাল।

২. সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভার আয়োজন।

৩. গ্রামে গ্রামে মা, শিশু এবং সর্বসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য ক্লিনিক এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন।

৪. মেটারনিটি চেক আপ

৫. হাসপাতালের পরিষেবা (ইনডোর, আউটডোর), ই.সি.জি।

৬. প্যাথলজি টেস্ট- ব্লাড, ইউরিন, স্টুল, স্পুটাম, মান্টু, প্রেগটেস্ট, সিমেন ইত্যাদি।

৭. এক্স-রে (চেষ্ট, বোন, বেরিয়ামলিন, অ্যাবডোমিন)

৮. অপরেশান- হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, টিউমার, গলব্লাডার, ফাইমোসিস ইত্যাদি।

৯. স্পেশালিষ্ট দ্বারা চিকিৎসা- নাক-কান-গলা, চোখ, দাঁত, শিশু, মহিলা, মানসিক।

১০. মোবাইল হেলথ কেয়ার সার্ভিস।[১৪]

সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রকল্প ১৯৭৮ এর সফলতার দিকটা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, সুন্দরবনের ইতিহাসে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এতো বড় সফলতা তৎকালীন পরিস্থিতিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ছিল। এই প্রকল্প রূপায়নের সময় অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে বা স্বাধীনতার সময় থেকে সুন্দরবনের এই রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের অধীন এলাকাগুলোতে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪০ জন। এই প্রকল্প রূপায়নের পরথেকে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং ২০০০ সালে জন্মহার কমে ২৫ জন হয়েছিল প্রতি হাজার জনসংখ্যায়। ১৯৭৬ সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল ২০ জন এবং ২০০০ সালে মৃত্যুহার কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৮ জন। ১৯৭৬ সালে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি

হাজারে ১৩০ জন, ২০০০ সালে সেটা কমে দাঁড়ায় ৪৫ জন। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের ক্লিনিক সেন্টারে চিকিৎসা পেয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক- ৩২ হাজার ৮০৬ জন। শিশু- ৪৪ হাজার ৬৮৩ জন, এক্সরে হয়েছে- ১ হাজার ১৪৩ জনের। রক্ত পরীক্ষা হয়েছে- ৮ হাজার ৪৭৬ জনের। মূত্র পরীক্ষা হয়েছে- ৬ হাজার ৮৭৯ জনের। হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়েছে- প্রাপ্ত বয়স্ক- ৯ হাজার ২৮৫ জন, শিশু- ২ হাজার ২৪৯ জন। এক্সরে হয়েছে ১ হাজার ৬৬৩ জন, রক্ত পরীক্ষা- ১ হাজার ৮৫২ জন, মূত্র পরীক্ষা- ৪৩৩ জন। ইজিসি- ৭৩২ জন, মল পরীক্ষা- ৩৩ জন। ০-৫ বছর বয়স্ক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় প্রতি বছর প্রায় ১১ হাজার। গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার। নব সন্তানবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার। অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি ব্যবহার প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার এবং স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রতি বছর প্রায় ৩০০ জন।

২০১০-২০১১ আর্থিক বর্ষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বর্হিবিভাগে রুগী ছিল ৮ হাজার ৪৮৮ জন, অন্তবিভাগে রুগী ছিল ২৪০ জন। আউটরিচ ক্লিনিকের দ্বারা অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের আউটরিচ পরিষেবার পরিসংখ্যান- ৩৯৮ জন রুগী। ক্লিনিকে ২৩৪ জন রুগী, চর্ম বিশেষজ্ঞ ৪টি ক্লিনিকে ১২৮ জন রুগী। ৫টি অস্থি বিশেষজ্ঞ ক্লিনিকে ২৪৩ জন রুগী। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ৬টি ক্লিনিকে ৬৩ জন রুগী, মনস্তত্ব বিশেষজ্ঞ ২টি ক্লিনিকে ৫১জন রুগী। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ৯টি ক্লিনিকে ২৭০ জন, ই.সি.জি. ৬০ জন, প্যাথোলজি পরীক্ষা ১১ হাজার ৩৩৭ জনের।[১৫] সুতরাং এই স্বাস্থ্য

পরিষেবা সুন্দরবনের সমাজ জীবনে কতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষা বিভাগ (১৯৭৯)

শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়- বরং স্বাক্ষর করা। স্বাক্ষর করার অর্থ হল লিখতে পারা, বুঝতে পারা, বলতে পারা ও বোঝাতে পারা। একটা সময় গ্রামের অধিকাংশ পরিবার তাদের ঋণের হিসাব মাটির দেওয়ালে চুনের ফোঁটা দিয়ে মনে রাখত, যার কুফল হিসাবে তারা সব সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকত। চরম দারিদ্র ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারত না এবং যারা স্কুলে যেতে যেতে যাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের স্বাক্ষর করে পুনরায় সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ২২টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষা বিভাগের জন্ম হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কোনদিনও সম্ভব নয় এই চরম সত্যটা মাস্টারমশাই তুষার কাঞ্জিলাল উপলব্ধি করেছিলেন।[১৬]

শিক্ষা বিভাগকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলি হল- ১. সমীক্ষার ভিত্তিতে পড়ুয়া নির্বাচন করা ২. গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন ও দায়িত্বভার অর্পণ ৩. পড়ুয়াদের স্বার্থে সময়সূচী ও পাঠকেন্দ্র স্থাপন ৪. গ্রাম কমিটি দ্বারা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষিকা নির্বাচন ও সংস্থা দ্বারা নিয়োগ ৫. পঠন পাঠন সামগ্রী, খেলাধূলায় সাজসরঞ্জাম সহ কেন্দ্র পরিচালনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ৬. নির্দিষ্ট মান উন্নয়নকারী

ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদান ও পাঠ ইচ্ছুকদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। শিক্ষা বিভাগের সফলতার বিষয়টি একটি ছকের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

সাল (ইং)	ব্লক সংখ্যা	শিক্ষাকেন্দ্র	ছাত্র	ছাত্রী	উপকৃত ছাত্রছাত্রী
১৯৭৯ (রাজ্য)	১টি	২২টি বিধিমুক্ত	৬৬২	৫৮৯	১২৫১
১৯৮৯-৯০ (রাজ্য)	৮টি	৫০৪টি বিধিমুক্ত	৯৯৫১	১৯৮০	১১৯৩১
১৯৯০-৯৫ (রাজ্য)	৮টি	৯০টি বিধিমুক্ত ১০টি আপার প্রাইমারী	১১৩৯৩	১১৮৬৫	২৩২৫৮
১৯৯৬-২০০৮ (কেন্দ্র)	৮টি	২০০টি বিধিমুক্ত	২৬০৪১	২৭০৪১	৫৩৫৭৯
১৯৯৮-২০০২ (কেন্দ্র)	৮টি	৪০টি বালোয়াড়ী সেন্টার	৭১২	৬৬০	১৩৭২
২০০৫-২০১২	৪টি	২০টি ই.জি.এস	৩৪৫	২৫৫	৬০০
২০০৫-২০১২	৪টি	৫৪টি এ.আই.ই	৩৫২	৩০৩	৬৫৫

অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ২২টি এন.এফ.ই সেন্টার, ১৯৮০ সালে ৪৭টি, ১৯৮৭ সালে বেড়ে হয় ৯টি ব্লকে ৫০৪টি সেন্টার ও দশটি আপার প্রাইমারী ও ৪০টি বালোয়াড়ি সেন্টার তৈরি হয়। ১৯৮৮ সালে রাজ্য সরকার নিজের দায়িত্বে স্বাক্ষরতা প্রকল্প চালু করে। সরকারি এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল টেগোর সোসাইটিকে। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্র সরকার ১০০টি ই.জি.এস সেন্টার এবং ১৯৯৫ সালে আরও ১০০টি মোট ২০০টি

সেন্টার কেন্দ্র সরকারের আর্থিক সাহায্যে চালু হয়েছিল ৮টি ব্লকে। ২০১১ সাল পর্যন্ত ৯২ হাজার ৬৪৬ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ হাজার ৮৩৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৮৯৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করেছে। এছাড়া শিক্ষা বিভাগ শুরু হওয়ার পর থেকে নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রকল্পের শুরুতে নারীশিক্ষার প্রসার ছিল ১৬.৬০ শতাংশ, কিন্তু এই প্রকল্পের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথেসাথে ২০১১ সালে নারীশিক্ষার প্রসার ৫৩.৩১ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুন্দরবনের নারীশিক্ষার পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়েছিল একথা আমরা বলতে পারি।[১৭]

প্রাণী সম্পদ বিকাশ (১৯৮৪)

আয়ের উৎস হিসাবে কৃষির পরে গরীব মানুষের বড় অবলম্বন ছিল প্রাণী সম্পদ। প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বর্তমান প্রাণী সম্পদ রক্ষা করা, মান উন্নয়ন করা এবং উন্নততর জাতের প্রাণী তৈরি ও সরবরাহ করা। এক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রতিষেধক ব্যবস্থা, সবুজ খাদ্য, শুকনো খাদ্যের ব্যবস্থা করা, এছাড়া প্রযুক্তিগত পরিষেবার দ্বারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ পালনের জন্য উৎসাহিত করা। প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত করে প্রাণী চিকিৎসার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়েছিল। ১৯৮৪-২০০০ সালের মধ্যে ৪ হাজারের বেশী সচেতনতামূলক শিবির, ১৫৬টি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার প্রাণী প্রতিষেধক, ৪ হাজারের বেশী কৃত্রিম গো প্রজনন, প্রায় ১ লক্ষ উন্নত জাতের মুরগি সরবরাহ, ৩ লক্ষের বেশী প্রাণীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৮] পোল্ট্রি, গোটারী, পিগারী, ডেয়ারী ফার্মের

স্থায়ী প্রদর্শনের এবং গোখাদ্য চাষের মাধ্যমে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই বিভাগে যে সমস্ত পদক্ষেপ গুলি নেওয়া হয়েছিল- ১. প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সচেতন সভা ২. প্রাণী সম্পদ পালনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (পোল্ট্রি, গোটারী, ডেয়ারী, পিগারী ইত্যাদি) ৩. উন্নত সবুজ গোখাদ্য ও সুষম খাদ্যের যোগান (নেপিয়ার, প্যারা, ভুট্টা, ওট, বারসীম, লুসান প্রভৃতি) ঘাস চাষ এবং মিকচার ফুড তৈরি ও যোগান ৪. বিভিন্ন উন্নত জাতের প্রাণী সরবরাহ (জার্সি গাভী, শ্বেতশূয়োর, গাড়োল ভেড়া, বাংলার কালো ছাগল, খাঁকি ক্যাম্পেল হাঁস, আর.আই.আর, ব্ল্যাক মিনার, হোয়াইট লেগহর্ন, টার্কি, বনরাজা, ব্রয়লার, ক্রয়লার প্রভৃতি জাতের মুরগি) ৫. প্রতিষেধক ব্যবস্থা ৬. কৃত্রিমভাবে গো প্রজনন ব্যবস্থা ৭. প্যারা ভেটেরিনারী ট্রেনিং এর ব্যবস্থা ৮. ভেটেনারী সার্জেন্ট দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।[১৯]

প্রাণী সম্পদ বিভাগের সফলতার বিচার করতে গেলে ২০১১ সালের পরিসংখ্যানকে উল্লেখ করতে পারি- চিকিৎসা পেয়েছে গরু- ১২৬৫ টি, ছাগল/ভেড়া- ২১৬৪ টি, মুরগি- ১,৬২,৭১২ টি, কুকুর- ৪১ টি, ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী, কুকুর মিলে ১,০৬,৯৯২ টি, ভিটামিন দেওয়া হয়েছে- ৬৩,৯৯৬ টি প্রাণীর, কৃমির ঔষধ দেওয়া হয়েছিল- ৩৯,৯৪৭ টি প্রাণীর, কৃত্রিম গো প্রজনন হয়েছিল- ৪৬৮ টি, মুরগী বাচ্চা সাপ্লাই হয়েছিল- ২৬,৭৫০ টি, গোখাদ্য চাষ- ৩৯টি প্লটে, পোল্ট্রি ট্রেনিং- ৫ টি, গোটারী ট্রেনিং- ১ টি, সচেতনতামূলক সভা- ১৮ বার, উপকৃত- ৭৭৬ জন। পোল্ট্রি ফার্ম ভিজিট ও প্রিভেনটিভ কেয়ার- ৬৫টি।[২০]

ক্যাপার্ট (১৯৮৬)

সুন্দরবনের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বন্যা বা বিপর্যয়ের পর এই চাহিদাটা সবথেকে বেশী দেখা যায়। দিল্লির ক্যাপার্ট নামক সংস্থার থেকে পাওয়া আর্থিক সাহায্যের ভিত্তিতে সুন্দরবনের যে গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছিল সেই প্রকল্প ক্যাপার্ট প্রকল্প নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলি হল- ১. পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ২. স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ৩. ঝড় সহনশীল গৃহ নির্মাণ ৪. জল নিকাশি ক্যালভার্ট নির্মাণ ৫. সাইক্লোন রিলিফ সেন্টার ৬. মজাপুকুর ও খাল সংস্কার ৭. উপভোক্তাদের প্রশিক্ষণ ৮. পরিবেশ ও উষ্ণায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই প্রকল্পের সফলতা গুলি হল- ঝড় সহনশীল গৃহ নির্মাণ-৭১৮ টি, ধোঁয়াহীন চুলা-১৭৭৪ টি, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার- ৭১৮ টি, নলকূপ স্থাপন- ২৪৪ টি, পুকুর সংস্কার- ৮০ টি, কমিউনিটি হল- ২২ টি, স্কুলের পুনর্নির্মাণ- ৩০ টি, মাধ্যমিক স্কুলে সাইক্লোন রিলিফ সেন্টার- ৪৪ টি, ক্যালভার্ট- ২২ টি, জেটি ঘাট- ১ টি, খাল সংস্কার- ১০ টি, ড্রেন সংস্কার- ১ টি।[২১]

রিলিফ ইউনিট বিভাগ (১৯৮৮)

সুন্দরবনের মানুষের কাছে বন্যা, ঝড়, খরা, নদীর বাঁধ ভাঙন, অতিবৃষ্টি, নোনাজলে কৃষি জমির ক্ষতি ইত্যাদি ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯৮৮ সালের ২৯শে নভেম্বর ২৫০ কিলোমিটার গতিতে ঘূর্ণিঝড় এবং ২০০৯ সালের ২৫শে মে যে আয়লা হয়েছিল তার আতঙ্ক এখনও সুন্দরবনবাসীর মনের গভীরে বিরাজ করছে। এই বিভাগের সূচনা হয়েছিল

১৯৮৮ সালের ঝড়ের পর থেকে। অর্থাৎ ঐ হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ছিল এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য।[২২] এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যেমন- ১. নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে বাঁশ, পেরেক, কাতা দড়ি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা ২. ঝড়, বন্যার্তদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, শুকনো ও রান্না করা খাবার প্রদান, পলিথিন, পোশাক, মশারী, পানীয় জলের সরবরাহ ইত্যাদি পরিষেবা প্রদান ৩. বিপর্যয় পরবর্তী স্বাস্থ্য সচেতনার ব্যবস্থা করা, চুন, ব্লিচিং, ফিনাইল প্রভৃতি জীবাণুনাশক দ্রব্যের ব্যবহার শেখানোর ব্যবস্থা করা ৪. ঘরবাড়ি মেরামত করার সামগ্রী প্রদান করা ৫. কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা, মাটি পরীক্ষা, টিলার, ট্রাক্টার দিয়ে চাষের ব্যবস্থা করা, নোনা সহনশীল বীজধান ও সবজি বীজ সরবরাহ করা ৬. মানুষ ও প্রাণী সম্পদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।[২৩]

স্যানিটারী মার্ট (১৯৯৩)

সুন্দরবনের শুচিতা ও নারী স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ১৯৯৩ সালে স্যানিটারী মার্ট নামে একটি বিভাগের সূচনা করা হয়েছিল। সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষা করা, রোগ জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অনেকগুলি পদক্ষেপ ছিল- ১. স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনী সভার আয়োজন করা ২. ম্যাজিক শো, পথনাটিকা, তরজানুষ্ঠান, লিফলেট, পুস্তিকা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে গণ সচেতনতা গড়ে তোলা ৩. কম খরচে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণ ৪. উন্নতমানের ধোঁয়াহীন চুল্লী নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ ৫. মনিটরিং ব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিষেবা প্রদানকে যদি বিচার করি তাহলে দেখব

২০১৪ সাল পর্যন্ত গোসাবা ব্লকের ৩৮ হাজার ৬৮৭ টি বাড়িতে সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ৩০টি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ১ হাজার ৬০০ টি বাড়িতে ধোঁয়াহীন চুল্লী বা উনান বসানো হয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ২ হাজার ৬৩৮টি পরিবারে সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল।[২৪]

মাটি পরীক্ষাগার (১৯৯৩)

মাটি সম্পর্কে সঠিক ভাবে জেনে সুষমহারে গাছের খাদ্য নিরূপণ ও মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখার পরামর্শ এবং ফসল চক্র নির্বাচন করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে পরীক্ষাগারটি স্থাপিত হয়। এই বিভাগের পদক্ষেপগুলি হল- ১. সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের পর্যায়ক্রমে যেমন- উঁচু, মাঝারী নিচু, সার দেওয়া জমি, সার না দেওয়া জমি, নদী বাঁধের নিকটস্থ জমি প্রভৃতি স্থানের মাটির নমুনা পরীক্ষা করা ২. পরীক্ষার ভিত্তিতে ফসল নির্বাচন ও সঠিক পরামর্শ প্রদান ৩. নির্বাচিত ফসলের জন্য কোন কোন খাদ্য প্রয়োজন তার তালিকা প্রদান ইত্যাদি ছিল এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই বিভাগের সফলতার দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ২০০৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৪০০০ হাজার মাটির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। প্রতিটি নমুনা পরীক্ষায় পি.এইচ, দ্রবীভূত লবণ, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশের পরিমাণ জানানো সম্ভব হয়েছিল। নমুনাগুলি যথাক্রমে গোসাবা ব্লকে ৫৪৪০, বাসন্তী ব্লকে ৪২৫০, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে ৩২০০, সন্দেশখালি ১ ও ২ নং ব্লকে ৫৩০, ক্যানিং ১ ও ২ নং ব্লকে ৩৯০ এবং কুলতলী ব্লকে ১৯০ টি মোট ১৪০০০ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল।[২৫]

সবুজায়ন প্রকল্প (১৯৯২) এবং গ্রীনিং ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম (১৯৯৫)

পরিবেশ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানব সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব মানুষ সৃষ্টির আগে প্রকৃতি পৃথিবীতে গাছ সৃষ্টি করেছে। মানুষ গাছের উপরে নির্ভরশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ গাছের উপকারিতাকে অস্বীকার করতে পারবে না। সুন্দরবন এলাকায় নদী বাঁধের আপেক্ষিক ক্ষমতা বাড়াতে, সামুদ্রিক ঝড়ের গতিবেগ কমাতে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে, ফল-ফুল ও কাঠের যোগান দিতে গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বিভিন্ন এলাকায় গাছ লাগানোর জন্য তৈরি হল সবুজায়ন বিভাগ। মানুষ তার বসত জমির আলে, রাস্তার পাশে, ড্রেনের পাশে, স্কুল, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, শ্মশান প্রভৃতি স্থানে গাছ লাগানোর কাজ শুরু করেছিল। নদীর চরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ রোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ম্যানগ্রোভ রোপণের ফলে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে, তেমন ভাবে ঝড় বা বন্যার সময় সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষার ক্ষেত্রেও অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল জাপানের ফেলিসিও ফরেস্ট ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থা গাছ লাগাতে এবং নার্সারিতে গাছ তৈরিতে নানা ভাবে সাহায্য করে থাকে। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের দ্বারা গাছ লাগানোর পরিমাণ হল- ম্যানগ্রোভ- ২৯,৯৮,৭৯৯ টি, ফলদায়ক গাছ- ৫৬,৪৭০ টি।[২৬] এইভাবে তারা সবুজায়ন প্রকল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছিল, যা বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাপানের সাহায্যে গ্রীনিং ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম ১৯৯৫ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ জাপানের সহযোগিতায় ১৯৯৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০টি নার্সারি তৈরি করা হয়েছিল। ওই নার্সারিগুলো

থেকে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ চারা বিক্রয় হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের অধীনে গাছের উপকারিতা ও পরিবেশে গাছের গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য গ্রামে গ্রামে ২৩টি সচেতনী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ২০১৪ সাল পর্যন্ত রাস্তায় গাছ লাগানো হয়েছিল ১৬.৯৫ একর জায়গায়, নদীর চরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছিল ৩৮.৬৬ একর জায়গায়।

রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ (১৯৯৯)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানুষ এবং এই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা সুন্দরবনের প্রতিটা মানুষের কর্তব্য ছিল। রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট সুন্দরবনের পাঁচটি ব্লকে (গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-২, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১) ১৯৯৯ সাল থেকে আর.সি.এইচ. প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কাজ করে আসছে। সুস্বাস্থ্যের জন্য দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার বিষয়গুলি সম্পর্কে কিশোর, কিশোরী, প্রজননক্ষম মহিলা ও পুরুষদের কাছে তুলে ধরা ও সরকারি পরিষেবার সুবিধা তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল। এই কর্মসূচীতে সঠিক বয়সে বিবাহ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জন্মরোধ, শিশু ও মাতৃত্ব জনিত মৃত্যুর হার কমানো, নিরাপদ মাতৃত্ব গ্রহণ, কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য, যৌনরোগ, গর্ভবতী মহিলাদের চেকআপ ও মা শিশুর চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের কার্যক্রমে নিম্নরূপ সফলতা দেখা গিয়েছিল- ১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২. কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল ৩. জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ৪. মাতৃত্ব জনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা

হ্রাস পায় ৫. প্রতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বৃদ্ধি পায় ৬. যৌনরোগ সম্পর্কে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ইত্যাদি।[২৭]

মেডিসিনাল প্ল্যান্ট (২০০৭)

প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনে সুন্দরবনের জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল নানা ধরণের নতুন নতুন রোগে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার অর্থ গরীব মানুষদের ছিল না। আধুনিক চিকিৎসায় ঔষধের দাম অনেক বেশী। এই প্রেক্ষাপটে ভেষজ চিকিৎসা অনেক বেশী সহায়ক। তাই ভেষজ উদ্ভিদের চাষ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্টের মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বিভাগ ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তাদের কাজ শুরু করেছিল। এই বিভাগের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল যেমন- ১. বেসলাইন সার্ভে ২. স্থানীয় কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করা ৩. দল গঠন ও দলীয় মিটিং দ্বারা সচেতনতা বৃদ্ধি করা ৪. ভেষজ উদ্ভিদের সমীক্ষা করা ৫. ভেষজ বাগান তৈরি করা ৬. ভেষজ উদ্ভিদ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।[২৮]

বাদাবন সংরক্ষণ ও জীবিকা সহায়ক প্রকল্প (২০০৭)

বিশ্ব উষ্ণায়নের গতিপ্রবাহকে কিছুটা প্রতিরোধ করতে ও সুন্দরবনের উপরে হয়ে চলা প্রকৃতির প্রকোপকে কিছুটা কমাতে ২০০৭ সালে তুষার কাঞ্জিলাল মহাশয়ের আগ্রহে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে সুন্দরবনবাসীর জীবিকা সহায়ক প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি। তাই ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে সাতজেলিয়া ও লাহিড়ীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা মূলক কর্মসূচিও ছিল। যেমন- কৃষি প্রশিক্ষণ, মাছ চাষ প্রশিক্ষণ, হাঁস ও মুরগী পালন, রিসোর্স কনজারভেশন ট্রেনিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।[২৯]

সহায়তামূলক প্রকল্পের মধ্যে ছিল- ১. পুকুর সংস্কার ২. জমি উন্নয়ন ৩. কৃষি সহায়তা ৪. মাছ চাষ ৫. মুরগী পালন ৬. হাঁস পালন ৭. নদীচরে গাছ লাগানো ৮. রাস্তায় গাছ লাগানো ৯. বাড়িতে গাছ লাগানো ১০. ম্যানগ্রোভ মডেল পার্ক তৈরি ১১. ক্ষুদ্র ব্যবসা, জৈব সার, মডেল ফার্মার, সৌরবিদ্যুৎ চালিত লণ্ঠন, ফ্লাড সেন্টার ইত্যাদি তৈরি।[৩০] এমনভাবে সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসে রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, কারণ এই প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এই সত্যতা খুব সহজেই প্রমাণিত হয়, যার কাজের ধারা বর্তমানেও অব্যাহত।

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশকেন্দ্র

সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় মানুষের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে জীবনের মান উন্নয়ন ও বৃহত্তর শক্তিশালী নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০০ সালে বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর গ্রামে, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসন্তী এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিত মহাকুর। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা সমাজের পিছিয়ে থাকা গরীব মানুষদের উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করেছিল। সূচনাতে বাসন্তী ব্লকের কিছু গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজ করলেও ধীরে ধীরে এই সংগঠনের কাজ আরও প্রসারিত হতে থাকে, এবং গোসাবা, ক্যানিং-১,

ক্যানিং-২, ব্লকে প্রসারিত হতে থাকে। ২০০৪ সাল থেকে সংগঠনের কাজ উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা, বাদুড়িয়া, দেগঙ্গা, বারাসাত প্রভৃতি ব্লকেও শুরু হয়। উত্তর ২৪ পরগণা ছাড়াও এই গ্রাম বিকাশকেন্দ্র বীরভূম জেলা এবং উড়িষ্যায়ও কাজ করছে।

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের কাজের বিশেষ বিশেষ দিক

১. গ্রামের গরীব মানুষ বিশেষত মহিলাদের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধক কাজ যেমন- কুটির শিল্প, মাছ চাষ, পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

২. স্থানীয় শিশুদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন আনে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা'- এই চিন্তাধারাকে সামনে রেখে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রম তাদের পথচলা শুরু করেছিল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিবেকানন্দ পাঠভবন বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এলাকাতে ১১টি নন-ফর্মাল শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এলাকার ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবতীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পরিবেশ শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩১]

৩. প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষকে নিয়ে পরিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার নির্মাণ ও সুস্থ পরিবেশের জন্য প্রচার ও কাজ শুরু করেছিল।

৪. স্বাস্থ্য পরিষেবায় পিছিয়ে থাকা গ্রামের জন্য তিনটি পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথমত, গ্রামের মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিষেবা পাওয়ার বিষয়গুলো সম্পর্কে

সঠিক ধারণা প্রদান। দ্বিতীয়ত, সপ্তাহে তিন দিন মাতৃনিকেতনে ও.পি.ডি. এর ব্যবস্থা। তৃতীয়ত, স্থানীয় জনগণের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩২]

৫. কৃষিকাজে জৈব সারের প্রসার ঘটানো। এই প্রসারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের (FFS) ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে গ্রামে গ্রামে দেশীয় বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়েছে।

৬. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুন্দরবন দিবস, পরিবেশ দিবস, হাত ধোওয়া দিবস, সভ্যতা বাঁচাও দিবস, বৃক্ষরোপণ দিবস ইত্যাদি দিনগুলো গ্রামের জনগণ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে মিলিত ভাবে পালন করে। সেই সঙ্গে এই বিষয়গুলোর তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটি সম্মুখ আলোচনা সভার দ্বারা সকলের মধ্যে সচেতন বৃদ্ধির চেষ্টাও করে।

৭. স্থানীয় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বছরে প্রায় ৩,৫০০টি স্কুল ড্রেস এবং শিক্ষার সামগ্রী দেওয়া ব্যবস্থা করেছিল, এবং এই ড্রেস প্রতিবছর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

৮. কুটিরশিল্প ও লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে কুটিরশিল্প ও লোক-সংস্কৃত মেলার আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কুটিরশিল্পীরা তাদের বানানো উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও আলোচনার দ্বারা উৎসবের মূল উদ্দেশ্যকে সমৃদ্ধ করে।

৯. সুন্দরবনের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধকে পুনরজ্জীবিত করার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত গ্রামে গ্রামে খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়জল, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীর সহায়তার দ্বারা পুনর্গঠনের কাজ করেছিল।[৩৩]

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র যে সমস্ত প্রকল্প দ্বারা সুন্দরবন তথা বিভিন্ন এলাকার মানোন্নয়নের কাজ করছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি দিক হল খাদ্য নিরাপত্তা। মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প রূপায়ন করেছিল। ২০০৯ সালের জেলা হিউম্যান ডেভলপমেণ্ট রিপোর্ট এবং ২০০৫ সালের গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার প্রতিবেদন দেখলে বাসন্তী ব্লকের দরিদ্রতার চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০০৫ সালের গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে দারিদ্রর দিক থেকে বাসন্তী ব্লক দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধ্যে সব থেকে পশ্চাদপর। মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ পরিবার দিনে একবেলাও খেতে পায় না। এই কারণে জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ২০০৩ সাল থেকে গরীব মানুষদের অবস্থার উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ন শুরু করেছিল। ২০০৯ সালের জেলা হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিপোর্টকে একটা সরণীর মাধ্যমে দেখিয়ে বাসন্তী ব্লকের দরিদ্রের চিত্রটিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলাম-

ক্রমিক	বিষয়	শতাংশ
১.	দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার	৬৪.৮৯
২.	দারিদ্রতার বিচারে ব্লকগুলির মধ্যে স্থান	২৯
৩.	দিনে ১বারও সব সময় খেতে পাই না এমন পরিবার	১১.২২
৪.	দিনে ১বার থেকে পাওয়া পরিবার	২৫.৭১
৫.	দিনে ২বার খেতে পাওয়া পরিবার	৩৩.৮১
৬.	দিনে ২বার পর্যাপ্ত খাবার পাই এমন পরিবার	২২.৭২
৭.	খাদ্যের কোন অভাব নেই এমন পরিবার	৬.৪৪

District Human Development Report 2009, South 24 Parganas, Development and Planning Department, Government of west Bengal

গরীব মানুষের আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প-

ক) পশুপালনঃ

গরীব মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ২৪টি গ্রামের ২৮০০ জন মহিলা এই প্রকল্পের দ্বারা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছিল। এই প্রকল্পের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গ্রামে গ্রামে পশু পাখির মৃত্যুর হার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছিল এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণে। যে সমস্ত এলাকাতে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল সেই সমস্ত এলাকায় পরিবার পিছু বাৎসরিক আয় ৪২০০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। গ্রামে মুরগী ও হাঁসের সংখ্যা স্থায়ী ভিত্তিতে ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া এই প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন পরিষেবা, ভ্যাকসিন দেওয়া, প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩৪]

খ) উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ

২০০৬ সাল থেকে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। এই প্রকল্প রূপায়নের আগে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র দ্বারা একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল। পরিবেশের উন্নয়নমূলক ওই সমীক্ষায় উঠে এসেছিল কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদাহরণসরূপ বলা যায় এই সার প্রয়োগে বহু স্থানীয় মৎস্য প্রজাতি প্রতি বছর বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। তাই এই মৎস্য প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং আরও উন্নতভাবে মৎস্য চাষ করার জন্য এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছিল। ২০০৬-০৭ সালে

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আই.জি.এফ. এবং জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ৩২ জন চাষির ৩২টি পুকুরে এক দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা হয়।[৩৫] ২০০৮ সাল থেকে এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা ১০০ জন স্থানীয় মৎস্যজীবী ও ৮ জন কর্মীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর একটা ছোট হ্যাচারি তৈরি করে সেখান থেকে বছরে ৪০০ বাটি রেণুপোনা তৈরি করা হয়েছিল। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র হ্যাচারির ব্যবহার সঠিক ভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৭টি পুকুরে হ্যাচারির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বিদেশ থেকেও মৎস্যজীবীরা এসেছিল। বর্তমানে এই এলাকার প্রায় অধিকাংশ পুকুরে পূর্বের মৎস্য চাষের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। এই কাজের সাথে যারা যুক্ত তাদের বাৎসরিক আয় তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের পর থেকে আয় ৪০০০ হাজার টাকা থেকে ১২০০০ হাজার পর্যন্ত বাড়তে শুরু করেছিল।[৩৬] স্থানীয় ছোট মাছের উৎপাদন বাড়াতে এবং সংরক্ষণ করতে গ্রাম কমিটির দ্বারা স্থানীয় জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে নানা ধরণের পদক্ষেপও নিয়েছিল।

গ) কুটির শিল্প

সুন্দরবনের গরীব পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুড়ি, ধূপ, পশম বস্ত্র, সেলাই, পুতুল তৈরি, তাঁত, হস্ত ও যন্ত্র চিকন ইত্যাদি কুটিরশিল্পের উন্নয়নের দ্বারা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে বর্তমানে মুড়ি, সেলাই ও পশম

বস্ত্র বোনাতে যথাক্রমে ৩২, ৪০, ৭৫ জন মহিলা যুক্ত হয়েছিল। এদের মাসিক আয় ছিল ৫০০-৩৫০০ টাকা। এছাড়া ধূপকাঠি তৈরি এবং পুতুল তৈরিও অনেক প্রসার লাভ করেছিল। নিয়মিত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত কাঁচামাল সরবরাহ এবং বাজারীকরনের মাধ্যমে প্রায় ১০০০ পরিবার নিজেদের স্থায়ী রোজগারের ভিত্তিস্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে সুন্দরবনের স্কুল ছুট বেকার যুবক- যুবতীদের কিভাবে কারিগরি দক্ষতায় পারদর্শী করে বেকারত্ব দূরীকরণ করা যায় সে বিষয়েও একাধিক পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছিল।[৩৭]

ঘ) জৈব কৃষি প্রকল্প

কৃষিতে উন্নতমানের প্রযুক্তি অবলম্বনের ফলে চাষিদের খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সুন্দরবনের চাষিদের অবস্থা শোচনীয়। এই পরিস্থিতিতে চাষিদের এই সঙ্কট থেকে মুক্ত করা এবং উন্নত মানের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ডেনমার্কের সাহায্যে ২০০৭ সালে এই জৈব কৃষি প্রকল্পের সূচনা হয়। বর্তমানে ৭ একর জমির উপরে জৈব কৃষি চলছে। এখানে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে জৈব সারও তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালে বছরে মোট ৩০ কুইন্টাল শাক-সবজি, ৪ কুইন্টাল মুগ ডাল, ৭৫ কুইন্টাল ধান জৈব সারের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়েছিল। ৫০০ জন চাষির জমিতে জৈব সার তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তারপর স্থানীয় কৃষকরা ২৫ একরের বেশী জমির উপরে শুধুমাত্র জৈব সারের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে শুরু করেছিল। তুলনামূলকভাবে দেখা যাচ্ছে জৈব সারের দ্বারা উৎপাদিত ফসলে পোকার আক্রমণ অনেক কম। এছাড়াও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছিল।[৩৮]

ঙ) স্বাস্থ্য প্রকল্প

জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্প মূলত বাসন্তী ব্লকের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বাসন্তী ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েতের ১৮টি গ্রামে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল- গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের, তিন বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা। সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া এবং কিভাবে ওই সমস্ত সুবিধা পাবে সেই সম্পর্কে অবগত করা। ২০১১ সালে ৪৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী ৪৩৮৫টি পরিবারের সাথে সক্রিয় ভাবে কাজ করছিল। ২০০৭ সাল থেকে 'মাতৃনিকেতন' শুরু হয়। এই ও.পি.ডি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৩০০০ হাজার রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।[৩৯] গর্ভবতী মা, বয়স্ক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বয়স্কদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। ক্লিনিকে কিছু কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন শিবির করে হামের টিকা, ভিটামিন 'এ' দ্রবণ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটি হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সেই সমস্ত এলাকাতে শিবির করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ২০০৯ সালে আয়লার পর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে শিবির করে দুর্গতদের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪০]

চ) শিক্ষা প্রকল্প

শিক্ষা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল এলাকার সমস্ত শিশুকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে শিক্ষার মান বাড়ানো। এই লক্ষ্যে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'বিবেকানন্দ পাঠভবন' প্রাথমিক স্কুল। এছাড়া শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এলাকার জন্য ১১টি

নন ফর্মাল স্কুল চলছে। ২০০৭ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্প বেতনে কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২০০৮ সাল থেকে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতি বছর স্থানীয় স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক, পঠন সামগ্রী দেওয়া হয়। এছাড়াও সমস্ত শিশু যাতে স্কুলে আসে তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।[৪১]

ছ) জীবনধারা (বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প)

সুন্দরবন একটি তুলনামূলকভাবে গরীব ও অনুন্নত এলাকা। এখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের নানা রকমের সমস্যা আছে। এই সমস্যার থেকে গরীব মানুষদের মুক্তি দেওয়া ও সচেতন করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৮টি গ্রামে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছিল। এই প্রকল্পের শুরুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। গৃহভিত্তিক মোট ১৬১৪ টি শৌচালয় বসানো হয়েছিল। ১৮টি কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করার জন্য স্ল্যাব বসানো হয়েছিল। ৩০৩ টি জলের নমুনায় আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছিল। পদযাত্রার মাধ্যমেও কোথাও কোথাও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। যে সমস্ত বাড়িতে শৌচালয় নেই সেই সমস্ত বাড়ির তালিকা তৈরি করে তাদের বোঝানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার ২৭টি স্কুলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য হাত ধোওয়া দিবস পালন করার সাথে সাথে ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে এবং কেন সকলের ডাস্টবিন ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়েও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৪২]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে বলা যায় যে, সুন্দরবনের সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসে এই দুটি বেসরকারি সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। সমাজের উন্নয়নের সাথে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের গভীর সম্পর্ক, কারণ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের পরিকাঠামোর রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন, ধ্বংস, বিপর্যয় প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই আবৃত করে রেখেছে। তাই এই সংস্থা দুটির কার্যক্রম সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই মূল্যবান। এই সংস্থা দুটির কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা না করে সুন্দরবন বিষয়ক গবেষণাকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এই সংস্থা দুটির সমস্ত কার্যকলাপ সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য। সুন্দরবনের গভীরে গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নতুন দিশা দেখানোর কাজ করছে এই সংস্থা দুটি। আজও এই সংস্থা দুটি তাদের উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং সুন্দরবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. "কম্পাস", টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, তুষার কাঞ্জিলাল সংখ্যা, ৫৭ বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১, পৃ- ৯

২. Interview: Rabindranath Mondal, Coordinator, Rangabelia Project, Date- 21.03.22.

৩. "Annual Report", Tagore Society for Rural Development, 2009-2010, p- 11.

৪. "মুখপত্র", টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫, পৃ-১০।

৫. তদেব, পৃ-১১।

৬. Planning Report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2001, p- 26

৭. 'মুখপত্র', টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ১৯৯৫, পৃ- ১৫

৮. সাক্ষাৎকার, প্রতিমা মিশ্র, সভানেত্রী, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ- ১২.০৯.২১

৯. তদেব,

১০. "রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট ২০১৫", টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া, ২০১৫, পৃ-১০

১১. “An Overview”, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, August 2011. P- 5

১২. তদেব, পৃ-১৬

১৩. “Annual Health Report”, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009-2010, p- 25

১৪. “মুখপত্র”, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০০৯, পৃ-২০।

১৫. “Annual Health Report”, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009-2010, p- 27

১৬. “কম্পাস”, টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, তুষার কাঞ্জিলাল সংখ্যা, ৫৭ বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১, পৃ- ১৩

১৭. “মুখপত্র”, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫, পৃ-২১

১৮. “Annual Report”, Tagore Society for Rural Development, Rangabrlia, 2009-2010, p- 15

১৯. “Annual Report” Tagore Society for Rural Development, 2010-2011, Rangabelia, p- 10

২০. তদেব, পৃ-১১

২১. “Annual Funding Agencies”, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009, p- 5

২২. “মুখপত্র”, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫, পৃ-২৩

২৩. তদেব, পৃ- ২৪

২৪. তদেব, পৃ- ২৪

২৫. তদেব, পৃ- ২৫

২৬. “Annual Funding Agencies” Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009

২৭. “Annual Health Report”, Tagore Society for Rural Development, Rangabrlia, 2011, p- 27

২৮. “An Overview”, Tagore Society for Rural Development, Rangabrlia, August 2011, p- 25

২৯. “Annual Report”, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2011, p- 11.

৩০. তদেব্,

৩১. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, মুখপত্র, ‘*এক দশক*’, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃ-২

৩২. তদেব, পৃ- ৩

৩৩. সাক্ষাৎকার, বিশ্বজিৎ মহাকুর, সম্পাদক, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, তারিখ- ১৩.০৩.২০২২

৩৪. “Annual report”, Joygopalpur Gram Vikash Kendra 2009-2010, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans, p- 7

৩৫. “An Overview”, Joygopalpur Gram Vikash Kendra, Basanti, August 2018. P- 17

৩৬. “আজকের বসুন্ধরা”, পরিবেশ বিষয়ক মাসিক, বিশেষ সংখ্যা চাষাবাদ, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১৮

৩৭. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, মুখপত্র, ‘*এক দশক*’, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃ-১০

৩৮. তদেব, পৃ- ১৭

৩৯. “Annual Report”, Joygopalpur Gram Vikash Kendra, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans, Basanti, 2010, p- 21

৪০. “Annual report” Joygopalpur Gram Vikash Kendra, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans, Basanti, 2009-2011, p- 13

৪১. “Educational Tourism in the Sundarbans”, Joygopalpur Gram Vikash Kendra, Basanti, South 24 Parganas, 2019, p- 3

৪২. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, মুখপত্র, “এক দশক”, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃ-১৪।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী ও জলসম্পদ

ইতিহাসের দুটি উৎস, সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব। বর্তমানে ঐতিহাসিকরা সাহিত্যের মাধ্যমে আহরিত 'স্মৃতি' বা আখ্যানকে রাষ্ট্রের প্রাধান্য বহির্ভূত উৎস হিসাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস, যার সম্পূর্ণ নথিভুক্তিকরণ আজও গবেষকদের কাছে অধরা। সেখানে সুন্দরবনের মত প্রান্তিক এলাকার ইতিহাসের অনুসন্ধানে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সুন্দরবনের ধারণাকে বাঙালি চেতনায় একটা নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আধুনিক সাহিত্যে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে সুন্দরবনবাসীর আঞ্চলিক জীবনের সামাজিক আখ্যান। সুন্দরবনকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারাতে সমাজ জীবনের বার্তা বহন করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গানের মধ্যে সুন্দরবনের প্রকৃতির সাথে মানুষের বন্ধনকে তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ সুন্দরবনবাসীর সমাজ জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রতি ভালোবাসা, জীবিকার জন্য সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আড়ালে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামী জীবন প্রভৃতি ধরা পড়েছে সাহিত্যের মধ্যে। সুন্দরবনের সাহিত্যে নদীকে সবথেকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নদীকেন্দ্রিক সুন্দরবনবাসীর জীবন, জীবিকা, সংগ্রাম, ভালোবাসা বারে বারে ধরা পড়েছে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সুন্দরবন নিয়ে বহু বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের আধারে প্রত্যক্ষ ইতিহাস রচনা একান্তই স্বল্প। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুতপা চ্যাটার্জী সরকার তাঁর গবেষণা গ্রন্থে সাহিত্য-আধারিত একটি অধ্যায় লিখেছেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ওই অধ্যায়ে তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত', যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'বনে জঙ্গলে', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুন্দরবনে সাত বছর' শিবশংকর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', মনোজ বসুর 'বন কেটে বসত' ও শঙ্কর বসুর 'বাদার গল্প' সাহিত্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১] এই লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আলোচ্য গবেষণাপত্রে বাংলা সাহিত্যের আলোকে সুন্দরবনের নদী বিষয়ে আলোকপাত করেছি, যা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়া ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে অমিতাভ ঘোষের উপন্যাস 'Hungry Tide' প্রত্যক্ষভাবে সুন্দরবনের 'Fragile' বা 'অনিত্য' বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুধার্ত তরঙ্গমালার সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী, যা আমার বোধশক্তিকে অনেক পরিণত করেছে।[২]

প্রাচীনকালে রচিত সাহিত্য থেকে শুরু করে এ সময়কালের সাহিত্যে নদী একটি অপরিহার্য বিষয়। গীত, কবিতা, উপন্যাস, গান, সিনেমা, সব শাখাতেই নদী যুক্ত হয়েছে কখনো প্রধান ভূমিকায়, কখনো বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে। নদী শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিদেশি সাহিত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মানুষের জীবনযাপন, সভ্যতার বিকাশ ও ঐশ্বর্য নির্মাণ, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রেম-ভালোবাসা সব কিছুতেই নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনে নদী কখনো বন্ধু, আবার কখনও বা ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ ও ধ্বংসকারী। নদীকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবন গড়া ও সভ্যতার ঐশ্বর্য নির্মাণ অকল্পনীয়। নদীভিত্তিক আঞ্চলিক বিভিন্ন সাহিত্যে এ সত্য নানা ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

নদী ও মানুষ একে-অপরের সম্পূরক। বাংলা সাহিত্যে এ সত্যতা ধরা পড়েছে বিভিন্ন রূপে।

"মানবজীবন সে তো গঙ্গার ভাসন্ত বাছাড়ির নাও। ফুটো থাকলেই টানতে থাকে তলানিতে আবার- মানবজীবন সে তো বর্ষার জোয়ার ভাটা জলেঙ্গার জল। দুদণ্ড জোয়ার তো চার দণ্ড ভাটা চার দণ্ড সুখ তো আট দণ্ড দুঃখ। তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই"।[৩]

মানবজীবন ও নদীর সাদৃশ্য এভাবে উত্থান-পতন, ভাঙাগড়ার রূপকে চিরকাল চিত্রিত হয়েছে। আর এই ভাবেই বিশ্বের সব ভাষায় লিখিত সাহিত্যের রূপকল্পে নদীর বহুমাত্রিক চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। আদি মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত কিংবা হোমারের ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী ব্যাপ্ত হয়েছে স্বর্গ–মর্ত্য-পাতাল জুড়ে। আর মর্ত্যের নদী সেখানে বিশাল অংশ দখল করে আছে। প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেমন নদীকেন্দ্রিক ছিল তেমনি সাহিত্যের আদি নিদর্শনে নদী তার গতিময়তায় কবিতা-গানে প্রাণ দান করেছে। বাংলা শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নগর-জনপদ গড়ে উঠতে নদী বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই সঙ্গত ভাবেই প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখনীতেও কোনো না কোনো ভাবে এসেছে নদীকথন। সাহিত্য বুননে ধৃত হয়েছে নদীর উপমা, প্রতীক আর চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্প। আদি মহাকাব্য রচনার সময় থেকে নদীর দেবতা অথবা দেবী কল্পনার শুরু এবং তাদের বন্দনা সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে। আবার একক কোনো নদীস্তোত্রও রচিত হয়েছে। কোথাও নদী জননী স্বরূপ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত "কপোতাক্ষ নদ" কবিতায় কপোতাক্ষের প্রশস্তি পেয়েছেন, "দুগ্ধ-স্রোতরূপি তুমি জন্মভূমি স্তনে"। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও এসেছে নদী; নির্বাণের রূপকে। তবে কবিতার থেকে বিস্তৃত পরিসরে উপন্যাসে

নদী ও জীবনকে রূপায়িত হতে দেখা গেছে বেশী। সুন্দরবনের বাঘ, কুমির, হরিণ, সাপ, প্রজাপতি, মৌমাছি, গাছ-গাছালি, ফুল, নদী-খাল-বিল, ধানক্ষেত, বনের মধু, কাঠ, নৌকার মাঝি, খোলা-মাঠ, মাছ, মাছের মীন, নদীর চর, জোয়ার-ভাটা, প্রভৃতি সুন্দরবনের সাহিত্যকে নির্মল আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে। সুন্দরবনের সাহিত্যের মধ্যে দেশ, কাল, পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অসাধারণ সব জীবন্ত চিত্র আঁকতে লেখক-শিল্পীরা মন ও মননের ভাণ্ডারকে ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাসে জারিত করেছে।

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ও নদী-তীরবর্তী জনসমাজ:

নদীকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে, উপন্যাস একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে যদি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে দেখব যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)" প্রথম বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছিল। যদিও উপন্যাস হিসাবে এ গ্রন্থটির প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারপরেও বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা মূলত এখান থেকেই শুরু। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা উপন্যাসকে নিয়ে গেছেন অবিশ্বাস্য উচ্চতর একমাত্রায়। আর সময়ের সিঁড়ি ধরে উপন্যাসেও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে এসেছে নান্দনিক পরিবর্তন। টানাপোড়েনের যে অমোঘ আকর্ষণ উপন্যাসের জন্মের মূল সূত্র, সময়ের স্রোতে উপন্যাস সেখান থেকে বেরিয়ে ইতিহাস, সমাজ-সমকাল, রাজনীতি, প্রেম, নিষিদ্ধ প্রণয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিপ্লব চেতনা, শহুরে ও গ্রামীণ জীবন ইত্যাদি নানা মাত্রিক রূপ গ্রহণ করেছে।

এ ধারাতে যুক্ত হয়েছে "নদীকেন্দ্রিক আঞ্চলিক উপন্যাস", যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম যোজনা। নদী ও মানুষের জীবন যে এক সূত্রে আবদ্ধ, সে সত্যতা ধারণ করেই বিভিন্ন মাত্রিকে নির্মিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, যা উপন্যাস সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রবাহ ধারা। সেই ধারায় পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- টমাস হার্ডি(১৮৪০-১৯২৮), উইলিয়াম ফকনার(১৮৯৭-১৯৬২), এমিলিয়া পারডো বাজান(১৮৫১-১৯২১), প্রমুখ।

প্রথম পর্বের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলি হল- প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত (প্রথমপর্ব ১৯১৭)।[৪] এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে নদী প্রথম নিজস্ব একটি তাৎপর্যতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু আমার গবেষণাপত্রের মূল বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সেই আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের সাহিত্যগুলি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল।

সুন্দরবন একটি নদীকেন্দ্রিক সামুদ্রিক ভূখণ্ড। নদী আর মানুষের জীবন এখানে একসূত্রে আবদ্ধ। এ অঞ্চলে নদীকে কেন্দ্র করেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত। আবহমান কাল ধরে বাংলা সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষের প্রসঙ্গ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীকে কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের জীবন, নদীর কোলেই গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ঐশ্বর্য। আবার নদীকেন্দ্রিক মানবসভ্যতা ও ঐশ্বর্য ধ্বংসও হয়েছে নদীর বুকেই। নদীর নিজস্ব একটি অদ্ভুত রহস্যময়ী রূপ আছে, যেখানে সে মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা দেওয়ার সাথে, সাথে তাদের ধ্বংসের কারণও হয়ে ওঠে। নদীভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে এই সত্য যেমন ধরা পড়েছে, তেমনিভাবে স্বতন্ত্রতার মর্যাদাও লাভ করেছে। পূর্ণাঙ্গ জীবনকে ধারণ করে মহত্বর শিল্প হিসাবে এই ধারার অনেক উপন্যাস কালোত্তীর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশি নদীকেন্দ্রিক জীবন চিত্রিত হয়েছে। বিংশ শতকের বাংলায় উল্লেখযোগ্য নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি হল- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইছামতী" (১৯৫০), প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা' (১৯৩৫), কাজী আব্দুল ওদুদের "নদীবক্ষে" (১৯১৯), কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের "চর-ভাঙ্গা চর" (১৯৫১), অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" (১৯৫৬), সমরেশ বসুর "গঙ্গা" (১৯৫৭), অমিয়ভূষণ মজুমদারের "গড় শ্রীখণ্ড" (১৯৫৭), কমল কুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী-যাত্রা" (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর "কাঁদো নদী কাঁদো" (১৯৬৮), সত্যেন সেনের "এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে" (১৯৭১), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "গহীন গাঙ"(১৯৮০), আবু ইসহাকের "পদ্মার পলিদ্বীপ"(১৯৮৮), দেবেশ রায়ের "তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত"(১৯৮৮), আব্দুল জব্বরের "ইলিশ মারির চর"। এছাড়া ঔপন্যাসিক সেলিমা হোসেনের "পোকামাকড়ের ঘরবসতি" (১৯৮৬) উপন্যাসে নদী, জল ও জীবন পরস্পরের রঙে মিশে একাকার হয়েছে। এই সমস্ত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে নদীর একটি আলাদা স্বতন্ত্র সত্তা আমাদের মধ্যে

ধরা দিয়েছে এবং নদী ও মানুষের জীবন একে অপরের সাথে কতটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেটা উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় নদী হল মানব সভ্যতার প্রাণ প্রবাহিণী। প্রাক-বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজও নদ-নদীর কীর্তি গাথা রচিত হচ্ছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা পূজার্চনায় ভারতবর্ষের উত্তর-মধ্য-দক্ষিণাংশে সাতটি নদীর বন্দনা করা হয়েছে- "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদা সিন্ধু কাবেরী জলে স্মিন সন্নিধিং কুরু"।[৫] মাতৃদুগ্ধের দ্বারা শিশু যেমন বাল্যবস্থায় লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে ওঠে, তেমনভাবে নদী তার জলের দ্বারা মাটিকে উর্বর করে শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে। নদী আমাদের মুখে আহার, বুকে বল ও দেহে কমনীয়তা জোগায়। নদীমাতৃক বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চল সুজলা সুফলা হয়ে ওঠায় এদেশের নদীগুলির অকৃপণ দান হতে কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়নি। মানব সভ্যতায় নদ-নদীর দান অতুলনীয়। বঙ্গদেশের মানব সভ্যতার উন্মেষে নদীর অবদান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুদূর অতীতকাল থেকে নদীর সঙ্গে মানুষের জীবিকা ও সভ্যতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা চিরন্তন ও শাশ্বত এবং এই সত্যতা আমরা নদীকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তথা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আরও একবার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।

সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নদী ও মানুষ একে অপরের সাথে কতটা সম্পর্কযুক্ত এবং পরিবেশও কিভাবে এই উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে তার আলোচনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে শুরু করা যথাযথ হবে বলে আমার মনে হয়। বঙ্গদেশ বিভাজনের আগেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসটা লিখে নদীকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করে

দিয়েছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি ছিল পরিবেশ ও নদী। অর্থাৎ এই উপন্যাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিমূলে আছে 'পরিবেশগত চেতনার প্রভাব'।

পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে পল্লীজীবন, পদ্মার বুকে যৌথ কর্মপ্রয়াস ও গোষ্ঠী জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তার মর্মমূলে মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে এই উপন্যাসের পরিবেশগত আলোচনা এক অর্থে Subaltern Study, প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা আছে যা পরিবেশ সঞ্জাত। তিনি দেখিয়েছেন নদী থেকে মাঝিরা শুধু যে আহার পায় তেমনটা নয়, জীবনরসও আহরণ করে। উপন্যাসে কুবেরের কাছে পদ্মা শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন আর বাস্তবের মোহনা। পদ্মাপারের ধীবর জীবনের অকৃত্রিম বাস্তব সংগ্রামী রূপ বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে।

নদী মানে অখণ্ড প্রবহমানতা, বিরতিহীন সময়ের হাত ধরে চলা, নদী মানে সভ্যতা, নদী মানে জনজীবন, নদী মানে জনজাতি যাদের জীবন ধারা নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নদী মানে নদীর রূপোলী ফসল - মাছ আর পদ্মা মানে ইলিশ মাছ এবং সেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সচল জীবন বৃত্ত। নদী মানে জেগে ওঠা নতুন চর এবং সেই চরের অবলুপ্তি, নদী মানে বানভাসি মানুষের হাহাকার, নতুন করে ঘর বাঁধার আকুতি, নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়া মানুষের জীবন প্রবাহ। নদীর কালধারায় ভেসে চলে মানুষের সুখ-দুঃখের বারমাস্যা, নদী মানে নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতা। আর এই সংস্কৃতি আবর্তিত বিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয় 'প্রকৃতি-পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে'। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে নরনারীর জীবনকথা, স্থানীয় আচার, সংস্কার, অর্থনীতি

প্রভৃতির সঙ্গে নদী প্রবাহ; নদীর খেয়ালী চরিত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই উপন্যাসে নদী যাপিত জীবনের প্রতীক। কখনও পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিকাশে সহায়ক, কখনও নির্মাণ-বিনির্মাণের নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির কাব্যময়তা, খেয়ালী চরিত্র, জীবিকার উৎস হিসাবে নদী এই উপন্যাসে স্বমহিমায় বিরাজিত। মূল সুরটি হল বৃত্তিজীবী নদীনির্ভর মানুষগুলির জীবনের চিত্র। জীবনের মূল কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে ও পরিবেশ চেতনায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নদী এখানে উপস্থাপিত। বর্তমানে পদ্মানদীর মাঝিরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করে না, তবু পদ্মা ছিল অবিভক্ত দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী, যেখানে সুন্দরবনের মানুষরা তাদের জীবিকা অর্জন করত।

উপন্যাসের শুরু এইভাবে- " বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শতশত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জেলে নৌকার আলোগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়"।[৬]– নদীবক্ষের অন্ধকারে এই দুর্বোধ্য সংকেত জেলে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের প্রতীক। পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে জেলেদের অসহায় ও বিপর্যস্ত জীবনধারার ছবি ফুটে উঠেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জেলেদের জীবনচক্র পদ্মানদীর সাথেই যে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত তার ইঙ্গিত দিয়েই উপন্যাসের শুরু। আর ময়না দ্বীপে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পদ্মায় হোসেনের নৌকা ভাসানোর মাধ্যমে উপন্যাসের শেষ। 'নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে'।....নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ'।[৭]– লেখক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বল্প পরিসরে যেন উপন্যাসের মূল সুর বেঁধে দিয়েছেন। নদীর জলস্রোতের বিপরীতে মানুষের জীবনস্রোত।

পদ্মার বিপ্রতীপে ধীবর জীবন চিত্রিত হয়েছে এই অংশে- "দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এ দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চাই, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়ে বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়, আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাহাঁকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না"।[৮] অর্থাৎ জেলে জীবনের সংগ্রাম ও তাদের সংস্কৃতির ধারা পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে, যা আজও সমগ্র সুন্দরবনের মাঝিদের মধ্যে বর্তমান। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের টিকে থাকার মধ্যে ও পরিবেশ চেতনার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে আমরা লক্ষ করি এক অদ্ভুত বাস্তুসংস্থান। "চরডাঙা পৌঁছিয়া দেখা গেল সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন, কোথাও একহাত একটু শুকনো জমি নাই। ঘরে ঘরে স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলরাশি থমথম করিতেছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়ির

সকলে আশ্রয় লইয়াছে বড়ো ঘরের চালার তলে কাঠের ছোটো স্থায়ী মাচাটুকুতে। দুটি গোরু ও বাছুরের জন্য তিনটি সুপারি গাছের মধ্যে মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাচা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ির পোষা কুকুরটিও স্থান পাইয়াছে সেখানে"।[৯]

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি একটা টান সর্বদা এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে- মাঝি পাড়ার সমীকরণে রঙের মাঝে কাদা। কুবের দোলের দিন কাদা ধুয়ে স্নান করতে পুকুর ঘাটে যায়, কপিলাও যায়; প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে এক অভূতপূর্ব চিত্রকল্প- 'আমারে রং দিলা না মাঝি? পাঁক দিমু কপিলা? রং তো নাই'।[১০] অর্থাৎ আমরা জানি রং সবসময় প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি নাও হতে পারে, কিন্তু পাঁক একেবারে প্রাকৃতিক উপাদান। চলমান নদীস্রোতের পটভূমিতে জেলে গ্রাম, কেতুপুরের এক প্রান্তে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের কথাই পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে রূপায়িত। বর্ষার বন্যা, শরতের আগমন, আশ্বিনের ঝড়ের বিপর্যয়, শীতের পর বুনো হাঁসের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া, বসন্ত দোল উৎসব- এই সমস্ত কিছুর মূলে আছে পরিবেশকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে নির্ণয় করে। পদ্মাতীরের মানুষগুলোর জীবন বিন্যাসে, জীবিকায়, সংস্কৃতি ও আবেগ-অনুভবে পদ্মা নদী সমগ্রভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়সহ কেতুপুর অঞ্চলের আরও শত সহস্র জেলে-মাঝি রাতে 'নদীর বুকে শতশত আলো' জ্বেলে মাছ ধরে। তাদের জীবন নির্ভর করে পদ্মার ওপর। কেউ মাছ ধরে, কেউ মাঝিগিরি করে। জেলে-মাঝিদের সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রেম-ভালোবাসা-সবই পদ্মাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়।[১১]

অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়েও আমরা নদীকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রকে দেখতে পাই। ‘তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতে চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না’। - এই সমস্ত কথাগুলি উপন্যাসের শুরুতে লেখক বর্ণনা করেছেন। নদীকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। অস্বীকার করা যাবে না যে, নদীকে কেন্দ্র করে বসবাসরত ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষ মাছ ধরে নৌকা বেয়ে জীবন অতিবাহিত করে। জীবন জীবিকার জন্য এ শ্রেণীর মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করলেও প্রাচুর্যের মুখ কখনো দেখতে পায় না। অভাব অনটন আর তাদের জীবন যেন একই সুতোয় গাঁথা। তবুও দুঃখ দারিদ্রময় জীবনের মধ্যেও দেখা দেয় প্রেম-ভালোবাসার ছোঁয়া, কিন্তু সেখানেও স্থায়ী ভাবে সুখের দেখা মেলে না। সংসার জীবন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। অদ্বৈত মল্লবর্মন সেই দৈন্য পীড়িত মানুষের মুখ এঁকেছেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে মৎস্যজীবীদের জীবন কষ্টের হলেও একেবারে অনাসক্ত নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে একসময় নদীতে চর পড়ে। নদী তার যৌবন হারায়, সেইসঙ্গে শেষ হয় নদীর মাছ ও জলের তরঙ্গ। নিরুপায় জেলেরা বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের যুগ-যুগান্তরের বাসস্থান ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আবার কেউ কোনো উপায় না পেয়ে সেখানেই থেকে যায়, তখন তাদের দুঃখের সীমা আরও দীর্ঘায়িত হয়। এ যেন এক নির্মম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, অসহায় তিতাস পাড়ের এসব দরিদ্র মানুষের দীর্ঘশ্বাস চিত্রিত হয়েছে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে।[১২] নদী তীরবর্তী মানুষের

পক্ষে নদীকে উপেক্ষা করে তার বিপরীতে চলা কোনদিনই সম্ভব নয়। নদীর জলের সাথে, নদীর আচরণের সাথে, নদী সংলগ্ন গ্রামগুলির জীবন বাঁধা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীর আচরণে পরিবর্তন আসে এবং নদীর পরিবর্তনের সাথে সাথে নদীকে কেন্দ্র করে সমস্ত মানব গোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট রূপ পরিষ্কার ভাবে উপস্থিত। তিতাসে যখন জল কম থাকে তখন মৎস্যজীবীদের জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং জলে ভরা অবস্থায় মৎস্যজীবীদের জীবনে কতটা ছন্দ ফিরে আসে তা এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে নদীর জলের সাথে মানুষের জীবন কতটা জড়িত থাকতে পারে তারও ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে।

তিতাস মেঘনার উপনদী। তিতাস নদীটি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে মেঘনার সাথে মেশে। তিতাসপাড়ের জীবনযাপনের সাথে সুন্দরবনের মাঝি ও মৎস্যজীবীদের সম্পর্ক নিবিড়, যা আজও একই ধারায় প্রবাহিত। অদ্বৈত মল্লবর্মন জেলে পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মৎস্যজীবীদের সঙ্গে ছিল তার প্রাণের স্পন্দন। সঙ্গত কারণেই এই স্পন্দনকে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে,- রাইন, সীন বা দানিয়ুবের মত ক্ষুদ্র নদীর তীরে যেমন গড়ে উঠেছে নদীকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতা, তেমন তিতাসের তীরেও গড়ে উঠেছে এক সৃষ্টিশীল জীবন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তিনি আরও লিখেছেন- "কত নদীর তীরে একদা নীল ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোঘল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়া আছে, মগধের ছিপ নৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে, উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের

রক্তে হাতি ঘোড়ার রক্তে সে সব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়তো তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখা কাটিয়া রহিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোনো ইতিহাস নেই। সে শুধু একটা নদী"।[১৩] তবে উপন্যাসের শেষ পর্বে তিতাসকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকা গোকর্ণ গ্রামকে একটি হতাশাগ্রস্ত গ্রামে পরিণত করা হয়েছে। দেখে চেনার উপায় নেই যে, এখানে একদিন জনবহুল মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। মালো পাড়ায় আর মালোরা নেই, আছে শুধু জল। তাদের বিশ্বাস ছিল তিতাস তাদের সাথে কখনও ছলনা করবে না, কিন্তু তিতাস তাদের সেই বিশ্বাসকে রাখেনি। মালোরা উদ্বাস্তু হয়ে যায় তিতাস থেকে। নদী তাদের আর মায়ের মত আশ্রয় দেয়না। তিতাসের কোলে জন্মানো তিতাসের সন্তানরা তিতাসেই হারিয়ে যায়। তিতাস নদীর গৌরবান্বিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শুরু হলেও শেষ হয় দীর্ঘ হতাশার মধ্যে দিয়ে। নদীর একটি দার্শনিক রূপ আছে - 'নদী বহিয়া চলে, কালও বহিয়া চলে। কালের বহিয়া যাওয়ার শেষ নাই। নদীরও বহিয়া যাওয়ার শেষ নাই'।[১৪] নদী শুধুমাত্র একটি নদী নয়। নদীর সাথে মানব জীবনের সমৃদ্ধি ও গৌরব বিরাজ করে। গৌতম ভদ্র তিতাস নদীকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। 'তিতাস শুধু নদী নয়, বরং একটি আলাদা অর্থনৈতিক জগৎ'।[১৫] অর্থাৎ শুধু তিতাস নদী নয়, সমস্ত নদীকে কেন্দ্র করে একটি করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। নদীর উপরে ভিত্তি করে ফুটে ওঠে মানব সমাজের মুখে হাসি। তাই নদী শুধুমাত্র একটা নদী নয়, তা সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছি।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটিও এমন একটি নদীকেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত উদাহরণ। 'গঙ্গা' উপন্যাসটি মূলত লড়াই করে বেঁচে থাকারই কাহিনীমালা। প্রকৃতি এবং

মানুষের মধ্যে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার নামই যে জীবন সেই কথাটি বারবার উঠে এসেছে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। হতদরিদ্র মৎস্যজীবীরা কখনও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে না। তাদের জীবনটা চলমান নদীর মত। কোথায় যে সুখের ঠিকানা, আর কোথায় বা গঙ্গার কৃপা, তারা সেটা জানে না। অথচ অন্যদিকে দাদন ব্যবসায়ীদের রক্তচক্ষু আর মহাজনদের চড়া সুদে টাকা ধার এবং ফড়েনিদের হুকুমজারি, অল্প দামে মাছ কিনে নেওয়ার ছলনা - সবই তাদের বিপক্ষে যায়, তারা শুধু অন্ধকারেই থেকে যায়। ঘরে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান প্রতীক্ষা করে বসে থাকে যে, কবে ঘরের মানুষ অকুল দরিয়া থেকে তাদের সকলকে বাঁচানোর রসদ নিয়ে ফিরে আসবে। অনেকসময় ফিরে আসে, আবার অনেকসময় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়। ফিরলেও তাদের স্বপ্নকে সত্য করার মত কোনো কিছু নিয়ে আসতে পারে না।[১৬] 'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গঙ্গা পাড়ের জেলেদের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যেমন লড়াই আছে, তেমনি আছে সংস্কার, আছে অফুরন্ত জীবন তৃষ্ণা, যৌনতা, কামনা বাসনা, নিত্য দুঃখ ও তারই মাঝে আনন্দ, ভয়, রোমাঞ্চ। এদের লড়াই নদীর ওপর, নদীর ভেতর। নদীর মধ্যে জীবনের লড়াইয়ের কাহিনী। এ লড়াই মানুষের নিজের সঙ্গে, নিয়তির সঙ্গে, আবার ঐ নদীর সঙ্গে। জল ও মানুষের, জলের প্রাণী মাছ ও মানুষের এক মরণপণ লড়াই, বাঁচার লড়াই। এই মানুষগুলির বাঁচার কাহিনীই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।[১৭]

পূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, একটি নদী কিভাবে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনদানের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ নদীকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নদীনির্ভর মানুষের বাস্তুতন্ত্র বা সামগ্রিক জীবন কাহিনী। এবার আমরা একটু ভিন্ন ভাবে ভিন্ন অর্থে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নদীর গুরুত্বকে বুঝতে

চেষ্টা করবো যে, একটি নদী কিভাবে একটি বিশেষ সভ্যতা বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মানদণ্ড হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তাকে এক সুবৃহৎ পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। তিস্তাকে অবলম্বন করে তার তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর যে ছবি লেখক এঁকেছেন তা যেন এক মহাকাব্যিক বিস্তার, ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেছে। একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনের নানা দিক আঁকতে আঁকতে তার মধ্যেই লেখক তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মূল সমস্যা, প্রকৃত সর্বহারা জীবনের যন্ত্রণাকে। তিস্তার চর ও তার তীরবর্তী কৃষক সম্প্রদায়, তাঁদের জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, মাটি নিয়ে লড়াই, তিস্তার তীরস্থ অরণ্যের বর্ণনা, তিস্তা ব্যারেজের ফলে তার তীরের জনজীবনের রূপের ভাবী পরিবর্তন এ উপন্যাসের বিষয়। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র মূল বিষয় তিস্তা-ব্যারেজ। তিস্তা-ব্যারেজ নির্মাণের আগে তিস্তাপারের মানুষের জীবনযাত্রা এবং তিস্তা-ব্যারেজ নির্মাণের পর তিস্তার জনজীবন এবং তার অরণ্য, বন্যজন্তু, সব কিছুর আমূল পরিবর্তনের রূপটি সম্পূর্ণ ভাবে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।[১৮]

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হল তিস্তা। তিস্তার মাঝে জেগে ওঠা তিস্তার চর, কৃষিকাজ ও সেই জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে অবিরত সংগ্রাম লেগে থাকত। কিন্তু তিস্তার বন্যার মধ্যে দিয়ে তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রামের নিষ্পত্তি হয়ে সকলের মধ্যে মিত্রতা গড়ে উঠত। তিস্তার বন্যা ভয়ানক। তিস্তা তার চরের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের উৎখাত করে বাড়ি-ঘর ভাসিয়ে, জঙ্গলের বনভূমি উৎপাটিত করে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দেয় চারিদিকে। মাটি নিয়ে মানুষে-মানুষে যে লড়াই, জমির ভাগাভাগি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তার নিষ্পত্তি করে দেয় তিস্তার বন্যা। 'এই ভাবে নদী বিভেদ মুছে

দিয়ে সাম্যবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে'। তিস্তা সাধারণ সময় ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের কাজ করে। কিন্তু বন্যার সময় সীমান্তচিহ্নকে লুপ্ত করে দেয়। বন্যার সময় বাংলাদেশ ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়। তখন মনে হয় সবাই একই দেশের মানুষ। তিস্তা এভাবে একদিকে যেমন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্তের কাজ করে, তেমনই বন্যার সময় দুটি রাষ্ট্রকে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে প্রেরণা দেয়।[১৯] তিস্তা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণের সাথে সাথে তিস্তার ইতিহাসে পরিবর্তন ঘটে। তিস্তা আর তার ইচ্ছা মত বয়ে যাবে না। তার জল বয়ে যাবে সুনির্দিষ্ট পথে। তিস্তা কুমারীত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রবেশ করবে মানবিক ইতিহাসে। 'তিস্তা নিয়ে কোনো উপকথা পুরুষানুক্রমে বয়ে আসবে না। তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী। তিস্তা তার মানবিক ইতিহাসের পর্বে ঢুকবে। তিস্তা বুড়ি, কুমারী হয়ে উঠবে'।

তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রকৃতির উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। অরণ্যের রূপ পরিবর্তন, সেই সঙ্গে অরণ্যের বিভিন্ন প্রাণীকে তাদের অরণ্যকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, ফলে তাদের অরণ্যকে ত্যাগ করে যেতে হল। ফলে তিস্তা পারের এতো দিনের গড়ে ওঠা সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তা একটি বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক রূপ বদলের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ একটি অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই ভাবে তিস্তা তার আঞ্চলিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়েছে।[২০] এই ভাবে তিস্তা শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের মূল সমস্যা গুলোর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।[২১] তাই সুন্দরবনের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তিস্তাপাড়ের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ।

তারাশঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলিবাকের উপকথা উপন্যাসের মধ্যেও আমরা একটি যুগের বা সভ্যতার পরিবর্তন চিত্রকে খুঁজে পাই। সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি নদী কোপাই। তার প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত বিখ্যাত বাঁকটির নাম হাঁসুলি বাঁক। সেই হাঁসুলি বাঁকে বসবাসকারী কাহারদের জীবনচর্চা, সংস্কৃতি, এবং তার ধ্বংসের পরিচয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস। ১৩৫০ সালের কোপাই নদীর ধ্বংসাত্মক বন্যা প্রতীকী রূপ লাভ করেছে। হাঁসুলিবাঁকের উপকথার অবসান একটা যুগের, একটা জীবনবোধের অবসান। সেই যুগের সাক্ষী বহন করছিল এতদিন কোপাই নদী। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোপাইও প্রাচীন উপকথাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ইতিহাসের বৃহৎ নদীতে মিলিত হল- উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।[২২] এই ভাবে নদী শুধুমাত্র প্রকৃতির বিষয় হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে কালের সাক্ষী।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী দ্বারা কিভাবে মানব সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। নদী শুধু একটা নদী হয়ে থাকে না। নদীতীরবর্তী মানুষের কাছে নদী হয়ে ওঠে তাদের জীবনধারণের কেন্দ্রবিন্দু। নদীকে কেন্দ্র করে তাদের সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়। তেমন ভাবে নদীর মধ্যেই তাদের বিনাস বা ধ্বংসের দ্বারা পুরানো যুগের বা সমাজের পরিবর্তন ঘটে নতুন যুগের সূচনা সাধিত হচ্ছে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়েতা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলি উপন্যাসেই নদীর প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে সাহায্য করে যা বদ্বীপ অঞ্চলের সুন্দরবনের মানুষদের নদীকেন্দ্রিক জীবনকে বোঝার সহায়ক হয়ে ওঠে।

সুন্দরবনের প্রবাহমান জীবন ও উপন্যাস:

সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের সম্ভার শুধুমাত্র নদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেটা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। সুন্দরবনের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে শুধুমাত্র নদী নয় সুন্দরবনের সমস্ত ছোটো, বড় বিষয় ধরা পড়েছে। তাই এই অংশে তেমন কিছু সাহিত্য সম্ভার নিয়ে আলোচনা করব যা শুধু মাত্র সুন্দরবনের একান্ত,নিজস্ব। সেখানে নদীর সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়গুলিও ধরা পড়েছে। সুন্দরবন একটি ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল এলাকা। এখানে বসবাস করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম নিজের সাথে নিজের। অর্থাৎ নিজের জীবনকে রক্ষার জন্য, নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সুন্দরবনবাসীকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু উপন্যাস আছে যার মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের এমন চিত্র ধরা পড়েছে। যেমন- মনোজ বসুর 'জল জঙ্গল' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'বন কেটে বসত' (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' (১৯৫৫), 'সুন্দরবন' (১৯৬২), 'বেনে বাউলে' (১৯৮৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর 'ঝিলেনগর' (১৯৭৫), শক্তিপদ রাজগুরুর 'নয়াবসত' (১৩৭৮), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীর সঙ্গে দেখা' (১৯৮০), 'বাগদা' (১৯৮৯), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলে জঙ্গলে কাব্য' (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' (১৯৮০), অমিতাভ ঘোষের 'ভাটির দেশ' (২০০৯), নিখিল মণ্ডলের 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন এবং অনিকেত' (২০১৩), প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, সমস্যা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির সারাংশ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে, উপন্যাসগুলি সুন্দরবনের সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ের মানুষের আগমন ও তাদের বিস্তার সম্পর্কে একটি উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই উপন্যাসে সুন্দরবনের নদীগর্ভ থেকে জেগে ওঠা চরগুলির জীবন ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমরা সকলে জানি বহু বছর ধরে নদীর মোহনার মুখে নদীর পলিস্তর জমে জমে সুন্দরবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকৃতির নিয়মে সেখানে গভীর বনের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের হস্তক্ষেপে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে নষ্ট করে গাছ কেটে বসতি নির্মাণের সংগ্রাম শুরু হয়। ঠিক একটি ঔপনিবেশিক কাঠামো তৈরির সময় যেমনটা হয়ে থাকে। এই ভাবে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের আদিপর্বের ইতিহাসকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মনোজ বসুর 'জল জঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত' উপন্যাস দুটি সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপনের বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে ফুটে উঠেছে।[২৩] এই দুটি উপন্যাসের কাহিনী প্রায় একই রকম। নিজের পরিবারের সাথে সাথে নিজের জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলার একটি সংগ্রাম। লোকজীবনের নানা সমস্যা, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ এই দুটি উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে। সুন্দরবন শুধু সুন্দর নয়, রহস্যময়ীও। তেমন রহস্যময়তার চিহ্ন ফুটে ওঠে শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', ও 'সুন্দরবন' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। আর্জান সর্দারের সংগ্রামী জীবনের সাথে তার রোমাঞ্চকর শিকারী জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী মিশ্রিত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বন ও মানুষের সংগ্রামের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীকে বর্ণনা

করা হয়েছে। -"বনে কিছু মানুষের জীবন যে দিতে হবে, ওরা এটা ধরেই নেয়। এমন সংসার আবাদে মিলবে না, যাদের একজন না একজন বনে প্রাণ দেয়নি। এ যেন বনের সঙ্গে আবাদের মানুষের নিয়ত সংগ্রাম। বনের উপর কে আধিপত্য করবে এ যেন তারই যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কখনও বনচারী মারা যায়, কখনও বা আবাদের মানুষ। দুজনই করে জীবিকার সংগ্রাম"।[২৪]

শিবশঙ্কর মিত্রের অন্য উপন্যাস 'সুন্দরবন' ও সুন্দরবনের সাহিত্যর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের মানুষ ও প্রকৃতির একাত্ম হয়ে ওঠার, ও একে অপরকে সম্মান করে চলার কাহিনীকে বর্ণনা করা হয়েছে। সুন্দরবন যে সুন্দরবনের সমাজ জীবনের সাথে কতটা জড়িয়ে আছে তারই একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল এই উপন্যাস। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় 'বাগদা' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক স্থানীয় জনজীবনের একটি জীবন কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। বাগদা চিংড়ি সুন্দরবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম অর্থ উপার্জনের। আর এই বাগদা চিংড়ি ধরার সাথে যারা যুক্ত তাদের জীবন কাহিনীকে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস, তাঁদের জীবনসংগ্রামের সাক্ষী হিসাবে। সুন্দরবনের গোসাবা এলাকার জেলে মালোদের জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ' ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপন্যাস।

এই ভাবে সুন্দরবনের প্রবাহমানতার হাত ধরে সাহিত্যের উপরে ভর করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সাহিত্যের মধ্যে রোমান্টিকতা থাকলেও সমস্ত কিছু বাস্তবকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। বলা যেতে পারে সাহিত্য সমাজেরই প্রতিবিম্ব। তাই সুন্দরবনের

ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করতে চাইলে সুন্দরবনের সাহিত্যকেও অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। সংগ্রামী না হলে এখানে সুন্দরবনের মতো স্থানে জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব নয়। কারণ একদিকে খরস্রোতা নদীর সাথে দিন-রাত্রি সংগ্রাম, অন্যদিকে বনের অভ্যন্তরে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সংগ্রাম। ফলে সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। এই ভাবে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের প্রকৃত সত্যগুলি সকলের সামনে খুবই সহজ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের অন্যতম একটি সফলতা।

নদীকেন্দ্রিক কবিতা ও গান:

সুন্দরবন ও কবিতা খুবই মধুর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, সুন্দরবনবাসীর কঠোর জীবনযাত্রাতে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি সাহিত্যিকরা তাদের মনের ইচ্ছা ও বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে ব্যাক্ত করেছেন। কবিতার মধ্যে দিয়ে এক একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপকে বাস্তবগত ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নদী, একটি ছোটো নাম। অথচ কত গভীর, প্রশস্ত ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে আছে মানুষের জীবনে। আমরা জানি, পৃথিবীর আদি সভ্যতা ও মনুষ্য বসতি এই নদীকেন্দ্রিক। নদীর ফলে নদীর তীরেই প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে যে, প্রাচীন মানুষ প্রধানত যাতায়াতের সুবিধার্থেই নদীর তীরে বসতি গড়ে তুলেছিল। নদীর জলে মানুষের জীবনধারণ ও চাষের সুবিধা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া নদীর মাছ, পরিবহণে সুবিধা, আমদানি-রপ্তানির সুবিধা ইত্যাদি বিষয় মানুষকে নদীকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলেছিল। ভাটির দেশ হওয়ায় সুন্দরবনে নদ-নদীর সংখ্যা

অপেক্ষাকৃত বেশী। শিরা-উপশিরার মত অসংখ্য নদ-নদী সুন্দরবনকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সুন্দরবনের এমন কোনো অংশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে নদ-নদী প্রবাহিত হয়নি। এই নদীর জলপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, নদী আর মানুষ একে অপরের সাথে কতটা অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। আর এই ঘনিষ্টতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কবিতা। এই সূত্র ধরেই সম্ভবত বাংলা কবিতায় নদ-নদীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য।

বাংলা সাহিত্যে নিম্ন গাঙ্গেয় সুন্দরবনকে নিয়ে লেখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কাছে গিয়ে সেখানকার জনজীবনকে না উপলব্ধি করলে সেটা সাহিত্যে সঠিক ভাবে তুলে ধরা সম্ভব না। সাজানো-চাপানো ঘটনার বুননে আর যাই হোক চমক সৃষ্টিকারী সাহিত্য করা সম্ভব হয় না। কেননা সুন্দরবনের নিজস্ব একটা মনোহরণকারী রূপ ও বৈচিত্র্য আছে, যা নান্দনিকতাময়। সুন্দরবন ও তার মানুষদের নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। "সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সাহিত্য, সুন্দরবন ও তার সম্পদকে সামনে রেখে সাম্প্রতিক সময়ের বহু কবি এই ধারায় এখনো সুন্দরবনের সাহিত্যকে সচল রেখেছেন"।[২৫] কবিতার মধ্যে দিয়েও যে জনজীবনের রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায় সেটা সুন্দরবনকেন্দ্রিক কবিতাগুলি না দেখলে বোঝা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবি সুধারানী মৃধার লেখা এমন একটি কবিতা-

"এ পারেতে থাকে মানুষ, ওই পারেতে বাঘ

পেরিয়ে নদী রাত বিরেতে, লোপাট করে ছাগ।

গভীর বনে নদীর জলে, বাগদা মাছের মীন

কেওড়া পাতায় যায় কেটে যায়, হরিণ গুলোর দিন।

বাঘ-কুমীরের ভীষণ লড়াই, কাঁপে সুন্দরবন

জানতে কথা সুন্দর দ্বীপের, রহিল নিমন্ত্রণ"।[২৬]

এমন ভাবে কবিতার মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক শোভা, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নদ-নদীকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনবাসীর জীবন প্রবাহের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নদী আছে, মাঝি আছে, নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবন সংগ্রাম আছে, আর নদী নিয়ে গান থাকবে না, সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে সেটা কখনও সম্ভব নয়। সুন্দরবন একটি নদীকেন্দ্রিক দ্বীপ। তাই নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনেক গানের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'ভাটিয়ালী গান'। যদিও এই গানের সৃষ্টি বাংলার সকল নৌকার মাঝিদের মুখে, তাই সুন্দরবনও ব্যতিক্রম নয়। সুন্দরবনের ব্যাপ্তি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। বাংলাদেশের মত সুন্দরবনও নদীমাতৃক। ফলে ভাটিয়ালী গানের অস্তিত্ব সুন্দরবনেও যে থাকবে সেটা কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না। নদীকেন্দ্রিক ভূখণ্ডে সবথেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নৌকা। নৌকা ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নৌকার চালক মাঝিকে জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করতে হয় নদীতে। পরিবার, পরিজনকে ছেড়ে নদীর উপরে তাদের ভেসে চলতে হয়। নৌকা চালানো মোটেও সুখদায়ক নয়। এই ভাবে কষ্টের মধ্যে দিয়ে সকলকে ছেড়ে একাএকা থাকার মধ্যে দিয়ে মাঝিদের মুখে উচ্চারিত হয় নানা ধরনের গান। আর এই গানের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় ভাটিয়ালী গান। তাই ভাটিয়ালী গান একান্ত ভাবে নদীকেন্দ্রিক মাঝিদের জীবনের গান। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "অন্তরের

সুগভীর ভাব ও সূক্ষ্মতার অনুভূতি প্রকাশ করি বার ভাটিয়ালীর যে শক্তি, তাহা বাংলার আর কোনো লোকসঙ্গীতে নাই"।[২৭]

আরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা নেরে,

আমি আর বাইতে পারলাম না।

আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠারে,

তরী ভাইট্যায় রয়, আর উজায় না।

ওরে জঙ্গী-রসী যতই কশি

ওরে হাইলেতে জল মানে না।

নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গারে,

নায়ে তো গাব-গয়নি মানে না।[২৮]

এই ভাবে ভাটিয়ালী গান বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে অন্যমাত্রা যোগ করেছে। অবচেতন মনের ভাবের এই রকম বহিঃপ্রকাশ সত্যি খুবই অকল্পনীয় ঘটনা। এই ভাবে মাঝিদের বিরহ বেদনার প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে নদীকেন্দ্রিক গান। এই গান বাংলা সাহিত্যের একান্ত সম্পদ। যার গুরুত্ব অতুলনীয়।

নদীকেন্দ্রিক ছোটগল্প:

নদীকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের গুরুত্ব অতুলনীয়। ছোটগল্পে নদী সাধারণত পটভূমি হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে নদী সর্বাপেক্ষা মানব কল্যাণের চালিকা শক্তি হিসাবে ধরা দিয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নদীর অবদান সবথেকে বেশী। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বহু কবি, সাহিত্যিক নদীকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্যের প্রসার ঘটিয়েছেন। নদীকেন্দ্রিক

ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষ ও নদীর একে অপরের সম্পর্কের মেলবন্ধন ফুটে উঠেছে। সেই সম্পর্ক সমস্ত নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই এই পর্বে শুধু মাত্র সুন্দরবন নয়, বাংলার সমস্ত নদীর সাথে সম্পর্কিত ছোটগল্পকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

নদী যখন নিয়তি:

বাংলা নদীকেন্দ্রিক ছোটগল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্পে নদী নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', এবং জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্প দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্পের মধ্যে 'নদী' কেমন ভাবে নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানব জীবনের ধ্বংসের, বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে সেই সত্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে পদ্মা নদীর বর্ষার সময়কার ভয়ঙ্কর রূপ অঙ্কিত হয়েছে। পদ্মা এখানে মানবজীবনের ত্রাস সৃষ্টিকারী নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানবসমাজকে শাসন করেছে, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' কামদা নদীর নিষ্ঠুর শয়তানী রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় গিয়ে বর্ষাকালে কামদা নদী কিভাবে একটা নাপিত পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে বিপর্যয়ের অতলান্ত গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করেছে সেই কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।[২৯] কামদা নদীটি নেপালের মাইথন নামক স্থানে উৎপন্ন হয়ে তরাই অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

জীবনধারণের প্রতীক নদী:

নদীর এই রূপটি সকলের আগে চোখে পড়ে। নদী শুধু নদী নয়, তা মানব সভ্যতার জীবনধারণের মাধ্যম। নদীকে কেন্দ্র করে কিভাবে মানুষ তাদের জীবন সংগ্রামে টিকে আছে সেটা সুন্দরবন বা যে কোনো সমুদ্রের উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে গেলে সহজে চোখে

পড়বে। নদীকে কিভাবে মানুষ তাঁদের কল্যাণে, তাঁদের জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রামে, তাদের জীবনধারণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, সেই রূপকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে। সমরেশ বসুর 'পাড়ি', দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্ষুধা' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমরেশ বসুর 'পাড়ি' গল্পের মধ্যে দিয়ে কিভাবে নদী ও মানুষ একে অপরের সমর্থক হয়ে উঠেছে তার বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে। যুগের পর যুগ সভ্যতার ধারক হয়ে নদী যেভাবে এগিয়ে চলেছে, আর তার এই এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ কিভাবে নদীকে অবলম্বন করে নিজেদের জীবনকে রক্ষা করে চলেছে তার সুন্দর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ নদী শুধুমাত্র মানুষের জীবিকার উৎস নয়, নদী সম্পূর্ন মানবসভ্যতার ধারক, বাহক হিসাবে এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের 'অনৈতিহাসিক' গল্পের মধ্যেও নদী শুধুমাত্র জীবিকার মাধ্যম হিসাবে নয়, মানব সভ্যতার অস্তিত্বের রক্ষাকর্তা হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। আরও একবার এই গল্পের মধ্যে নদী ও মানুষ একে অপরের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্ষুধা' গল্পের মধ্যে দিয়ে অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষের কাছে নদী কিভাবে জীবনের অন্য মানে সৃষ্টিকারী মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পে পরান মুচি ও তার দূর সম্পর্কের ভাইঝি খুশির দারিদ্র লাঞ্ছিত সংসারের দুঃখ কাহিনী এবং নদী কিভাবে তাদের এই জীবনকে পরিবর্তন করার সুযোগ দিচ্ছে তার করুণ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এখানে নদী একদিকে যেমন অন্যের খাদ্য যোগানের প্রধান মাধ্যম, আবার অন্যদিকে সর্বগ্রাসী, ভয়ঙ্কর, নির্মম। গল্পে সুন্দরবনের সর্বগ্রাসী আঠারোবাঁকী নদীর নিম্নলিখিত রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে-" আঠারোবাঁকীর ভয়ঙ্কর গর্জন কানে তীরের

মতো আঘাত করে। ...আবহমান কাল ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে রাক্ষসী। খেয়েছে জনপদ। মানুষের সাধ আহ্লাদ খেয়েছে বন-বনান্তর"।[৩০]

সমাজের প্রতিরূপ নদী:

নদীকেন্দ্রিক গল্পের মধ্যেও নদী কিভাবে সমাজজীবনের প্রতিরূপ হিসাবে চিত্রিত হতে পারে তা বেশ কয়েকটি ছোট গল্পের মধ্যে ধরা দিয়েছে। সমকালীন সময়ের ওঠাপড়া, পরিবর্তন, মূল্যবোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়, সবকিছু নদীর প্রতিরূপে ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে অসীম রায়ের 'লখিয়ার বাপ', ভগীরথ মিশ্রের 'নৌকাবিলাস', অমর মিত্রের 'নদীর ভেতর থেকে আকাশ' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অসীম রায়ের 'লখিয়ার বাপ' গল্পে একটি রুক্ষ, শুকনো নদীকে কেন্দ্র করে অবস্থিত অন্ত্যজ জনসমাজের পানীয় জলের জন্য যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই কাহিনী ফুটে উঠেছে। নদীটিতে জলের পরিবর্তে উষ্ণবায়ু বা লু প্রবাহিত হয়। গ্রামের প্রধানের বাড়িতে জল থাকলেও অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত কেউ জল নেওয়ার অনুমতি পায় না। ফলে তাদের অনেক দূর থেকে জল আনতে হয়। জল চুরির অপরাধে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়। এই ভাবে নদীর দ্বারা সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পানীয় জলের জন্য যে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে এবং শেষে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে সমাজের সেই করুণ অত্যাচারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। ভগীরথ মিশ্রের 'নৌকাবিলাস' গল্পের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সবথেকে বড় একটি সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সমস্যা হল 'সাম্প্রদায়িকতা'। ইছামতী ও রায়মঙ্গল এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে মানুষের বিবেক,বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

নৌকাবিলাস গল্পে, নদীর দর্পণে এই পচে যাওয়া মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটেছে তীব্র ব্যঙ্গের আধারে।[৩১]

জীবনের শেষ আশ্রয় নদী:

এই পর্বে নদী মানবজীবনের শেষ অবলম্বন হিসাবে ধরা দিয়েছে। মানবজীবনের শেষ পর্বে যখন সমস্ত পথ বন্ধ তখন শান্তিলাভের মাধ্যম হয়ে উঠেছে নদী। বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অবস্থানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। জগদীশ গুপ্তের 'সবার শেষে গয়া', মনোজ বসুর 'বাদাবনের গান' গল্প দুটিকে উল্লেখ করা যায়। এই গল্প দুটিতে বিষণ্ণ, বিপর্যস্ত মানুষের শেষ আশ্রয় হিসাবে নদীকে অঙ্কিত করা হয়েছে। নদী এখানে জীবনের সমস্ত বিষণ্ণতাকে ধারণ করেছে।[৩২] যে সমস্ত সাহিত্যিকরা সুন্দরবনকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সুন্দরবনের সাথে মিশে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শিবশঙ্কর মিত্র। শিবশঙ্কর মিত্রের সুন্দরবনকেন্দ্রিক গল্পগুলো স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই গল্পে সুন্দরবনের দরিদ্র, অভাবী মানুষেরা স্থান পেয়েছে। শিবশঙ্কর মিত্রের গল্পগুলো ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে লেখা।[৩৩] গল্পগুলি হল- 'বাঘের দেখা' (১৯৬২), 'বিশু বাউল' (১৯৭৯), 'সুন্দরবনের হঠকারিতা' (১৯৭৬), 'এক যে ছিল সুন্দরবন' (১৯৭৯), 'বনের চোরের উপর শহরের বাটপারি' (১৯৮৩), 'ধাইরাজ' (১৯৮৬), বীরাঙ্গনা না সুন্দরবনের মা' (১৯৮৭), 'সুন্দরবনের সততা' (১৯৮৮), 'সুন্দরবনের ছাটাবাড়ি লাঠি' (১৯৮৮)।[৩৪] এই সমস্ত গল্পের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের এক একটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বাঘ, হরিণ, বন, মানুষ মিলিয়ে সমাজজীবন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক সাহিত্যের শেষ পর্বে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল সেগুলো উল্লেখ করা এই সাহিত্যের আলোচনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের জল, জঙ্গল, মাঝিমাল্লা, মৌলেদের নানারকম সংস্কার কাহিনী প্রভৃতি সুন্দরবনকেন্দ্রিক সিনেমা তৈরিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সুন্দরবনের বাঘের চরিত্র নিয়ে তৈরি কমল সদানাথের 'রোর' (২০১৪), মৎস্যজীবীদের জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে গৌতম ঘোষ পরিচালিত, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ অভিনীত 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৯৩), রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' (১৯৬০), সতীদাহ প্রথা নিয়ে গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'অন্তর্জালী যাত্রা' (১৯৮৭), ঐতিহাসিক মঙ্গলকাব্যে সাপ নিয়ে রচিত 'বেহুলা লখিন্দর' (১৯৬৯), মিঠুন চক্রবর্তী- রোজিনার 'অন্যায় অবিচার' (১৯৮৫)[৩৫], সুন্দরবনের নয়া বসতি স্থাপনের কাহিনীকে কেন্দ্র করে শক্তি সামন্তের পরিচালনায় উত্তম কুমার অভিনীত অমানুষ (১৯৭৫), আনন্দ আশ্রম (১৯৭৭) প্রভৃতি সিনেমা সুন্দরবনের সাহিত্যর সাথে সাথে সুন্দরবনকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। সুন্দরবনের বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র গভীরভাবে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে উপন্যাসগুলোর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মধ্যে 'কন্যাপণ' প্রথা এবং 'ইছামতী' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে 'কুলীন বিবাহের' কথা উঠে এসেছে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্র হল পরিবেশ ও মানুষের বন্ধনের প্রতীক। অর্থাৎ পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত একটি দর্শন। যা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে সমাজজীবনের উন্নয়ন ও মেল বন্ধনকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে।[৩৬] বিশেষত নিম্নবর্গের ইতিহাস ও বাস্তুতন্ত্রকে বোঝার জন্য সাহিত্যই ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভরসাস্থল।

সুন্দরবনের নদীসম্পদ

সমতলের বুকে বয়ে চলা মায়াবী নদীর ভূখণ্ড সুন্দরবন। নদী বিধৌত পলিমাটির দ্বারা গড়ে উঠেছে সুন্দরবন। তাই সুন্দরবনের চারিদিকে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকা নদী থেকেই জীবনের সমস্ত কিছু খুঁজে নিতে হয় সুন্দরবনবাসীকে। সুন্দরবনবাসীর জীবনধারণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবই নদী মিশ্রিত, নদী আশ্রিত। নদীর ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে সুন্দরবনবাসীর জীবনধারা, তাঁদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। নদীর জলেই জীবনধারণ, নদীর জলের মাছ, নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদীর তীরে মেলা-উৎসব, আবার নদীর জলে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, শুদ্ধিকরণ, ইত্যাদি যুগে যুগে সুন্দরবনকে সমৃদ্ধতর করে চলেছে। নদী কিভাবে সুন্দরবনবাসীর জীবনকে প্রভাবিত করে তুলেছে সেটাই আলোচনা করা আলোচ্য প্রেক্ষাপটের বিষয়।

সুন্দরবনবাসীর জীবনে নদীর প্রভাব

নদীর সাথে মানুষের সম্পর্ক সুপ্রাচীন কাল থেকে দেখে আসছি। তবে নদীর সাথে বাংলা তথা বাঙালিদের সম্পর্ক যে একটু বেশি মাত্রায় সেটা সুন্দরবন এর সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের অন্য স্থান নিয়ে আলোচনা করলে পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"এইসব নদনদীর ইতিহাসই বাঙলার ইতিহাস। ইহাদেরই তীরে তীরে মানুষ-সৃষ্টি সভ্যতার জয়যাত্রা; মানুষের বসতি, কৃষির পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প-সাহিত্য ধর্মকর্ম সব-কিছুর বিকাশ। বাঙলার শস্য সম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত উদ্দাম বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যায়, মানুষ গৃহহীন পশুহীন হয়; আবার এই বন্যাই তাহার মাঠে মাঠে পলি ছড়াইয়া; এই পলিই সোনার সারমাটি"।[৩৭]

ঐতিহাসিক Richard M. Eaton তাঁর The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760 নামক বইটিতে বাংলার নদী, সংস্কৃতি ও মানুষের উপর নদীর প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছে।[৩৮] সুন্দরবনবাসীর জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে নদীর অবদান অনস্বীকার্য। প্রথমদিকে এই এলাকার মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার, বনসম্পদ আরোহণ, জনমজুর ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বের সাথে বর্তমান সুন্দরবনের জীবিকার মিল থাকলেও আরও নানা ধরনের বিকল্প জীবিকা সংগ্রহের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের নদীর অবদান অনস্বীকার্য। যেমন- মীনধরা, নদী, খাল, মোহনায় মাছ ধরা, নদী ও গভীর জঙ্গলের ভিতরে কাঁকড়া ধরা, ফিসারি বা মেছোঘেরিতে মাছ, কাঁকড়ার চাষ, মোম-মধু-কাঠ প্রভৃতি বনসম্পদ আহরণ, মাছ-কাঁকড়া আড়ত ও খুচরো ব্যবসা, জাল, আটোল, পোলো, বর্শা, প্রভৃতি মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম তৈরি, সুন্দরবনের বিভিন্ন হাট ও গঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য, জল ও স্থল পথের পরিবহণের সাথে যুক্ত কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পেশা, যা সুন্দরবনবাসীর জীবনধারণের পথে একটু হলেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত পেশার কথা উল্লেখ করা হলেও সুন্দরবনের ৯০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত। তবে কৃষিকাজ সারা বছর ধরে না হওয়ায়, আর সকলের জমি না থাকার ফলে বছরের বাকি সময়গুলি তারা এই সমস্ত পেশা অবলম্বন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।[৩৯] সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় নদীর অবদানের একটা উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল জাল টেনে জীবন ধারণ। প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা বাঁশের চারটি চেড়া, সেগুলি আয়তক্ষেত্রের আকারে একে অন্যের সাথে বাঁধা থাকে। এই কাঠামোর সাথে এক প্রকার পাতলা জাল যুক্ত থাকে। জালটি চারকোণা এবং বেশ কিছুটা লম্বা থাকে। বাঁশের চেড়ার সাথে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। আর

ওই দড়ি ধরেই নদীর পাড় ধরে স্রোতের অনুকূল বা প্রতিকূলে একজন টানতে থাকেন। ফলে জালের মধ্যে নদীর নানা ধরণের ছোট ছোট মাছের পোনা আটকে যায়। এই ভাবে বেশ কিছুটা জাল টেনে নিয়ে যাওয়ার পর জালের ভেতরের জঞ্জালেপূর্ণ ছোটো ছোটো মাছের পোনা গুলোকে বাছার কাজ শুরু হয়। বাছাই পর্বে কেবলমাত্র এক ধরণের বিশেষ মাছের পোনাকে আলাদা পাত্রে তুলে রাখা হয় এবং বাকি সমস্ত কিছু আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ওই বাছাই করা মাছের পোনা বাজারে বা গ্রামে আসা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে সংসার খরচ চালায়। এ ভাবেই চলে তাদের জীবন। এই দৃশ্য সুন্দরবনের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি অঞ্চলে দেখা যাবে। আর যারা এই জাল টানেন তাদের বেশিরভাগ নারী। ওই বিশেষ ধরনের মাছের পোনাকে স্থানীয় ভাষায় 'বাগদা' বলা হয়, অর্থাৎ মীন ধরা।[৪০]

মৎস্য ও কাঁকড়া শিকারের সাথে যুক্ত মৎস্যজীবীদের সাংগঠনিক ইতিহাসের কথা প্রথম প্রাচীনকালে কৈবর্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে জানতে পারি। ভারতীয় মৎস্য সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের সমুদ্র মোহনা, নদী, খাল প্রভৃতি মাছের নির্ভরযোগ্য উৎসস্থল। সুন্দরবনে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্ঠান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মাছ ধরার সাথে যুক্ত।[৪১] সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মাছ ধরার সাথে যুক্ত। এখানে শতকরা ৯০ শতাংশ পরিবার কৃষিকাজ করে। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মানুষের নিজস্ব জমি নেই। এছাড়া ৫.৩৯ শতাংশ পরিবার মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মোম-মধু সংগ্রহ করা, প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত।[৪২] সুন্দরবনে যারা কাঁকড়া ধরে তাদেরকেও মৎস্যজীবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সুন্দরবনের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নানা ধরণের জীবিকার মধ্যে কাঁকড়া ধরা একটি উল্লেখযোগ্য পেশা। নদীকে অবলম্বন করে

জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে গভীর বনে প্রবেশ করে কাঁকড়া ধরার জন্য। যে সমস্ত সুন্দরবনবাসী কাঁকড়া ধরার সাথে যুক্ত তারা সাধারণত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে জঙ্গলে যায়। এই পেশাতে যুক্ত যারা তাদের জমি-জমা নেই বললেই চলে। সুতরাং সারা বছর তাদের নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করতে হয়। কাঁকড়া সবথেকে কোথায় বেশি পাওয়া যায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল গভীর জঙ্গলে যেখানে মানুষ তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারে না, সেই সমস্ত স্থানে কাঁকড়া সবথেকে বেশি পাওয়া যায়। ফলে দরিদ্র মানুষ বেআইনি ভাবে সংরক্ষিত বা কোর অঞ্চলে প্রবেশ করে কাঁকড়া ধরে এবং বাঘের কবলে মারা যায়। এই ঘটনা সুন্দরবনের নিত্যনৈমিত্তিক গল্প, সেই মানুষেরা তাদের বেআইনি প্রবেশের জন্য ক্ষতিপূরণ পায় না। অর্থাৎ গভীর জঙ্গলে বিপদের আশঙ্কাটাও সবথেকে বেশি। কারণ বাঘ, বিষধর সাপ, কুমির, প্রভৃতি জঙ্গলের গভীরে বসবাস করে। জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলেও মানুষগুলো ছুটে যায় বনে, কারণ তাদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় থাকে না। জীবনধারণের জন্য তারা বনে যেতে বাধ্য হয়।[৪৩]

নদী যে মানুষের জীবনধারণের সহায়ক হয়ে ওঠে তার আরও একটি উদাহরণ হল জলে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহের সাথে যুক্ত মানুষের জীবনধারণকে কেন্দ্র করে। খরস্রোতা নদীর বাঁকে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার সময় নারী, পুরুষ, শিশু সকলের জমায়েত হয়। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর স্রোতের টানে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। স্থানীয় ভাষায় এই কাঠকে "মুড়ো কাঠ" বলা হয়। সব ঋতুতেই এই কাঠ সংগ্রহের কাজ চলে। তবে এই কাঠ বেশির ভাগ পূর্নিমা ও অমাবস্যার কোটালের ভাটায় বেশি পাওয়া যায়। শীতের সময় একটু কম হলেও বাকি সময় অনেক মানুষ এই কাজে অংশ গ্রহণ করে।

এই কাঠ মূলত সুন্দরবনের বাইন, সুন্দরী, কেওড়া, ওড়া প্রভৃতি গাছের গুঁড়ি। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ গাছের গুঁড়িও কেউ কেউ পেয়ে যায়। নিজেরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার পাশাপাশি এর বেশীর ভাগটা ২০০ থেকে ২৫০ টাকা বাজার দরে বিক্রি করে দেয়। অনেক পরিবার আছে যারা এই কাঠ সংগ্রহের উপর নির্ভর করে তাদের জীবনধারণের সংগ্রাম করে চলেছে, বিশেষ করে সেই সমস্ত স্বামী হারা বিধবা মহিলা যাদের পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই।[৪৪] বর্তমান গবেষকের শৈশবের অভিজ্ঞতায় এই জালটানা ও কাঠ সংগ্রহের ইতিহাস রয়েছে। গবেষকের কথায় সুন্দরবনের পাঠানখালী অঞ্চলে তাঁর গ্রামে ধনাই সরদার নামের একজন দরিদ্র মানুষের কথা জানা যায়, যার একমাত্র কাজ ছিল নদীতে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করা এবং সেই কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা। সুন্দরবনে বহু শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে। এর মধ্যে 'দাস' একটি শ্রেণী। কেউ কেউ নিজেদের 'চর্মকার' বা 'মুচি' বলে থাকে। এরাও সুন্দরবনের নদীকে অবলম্বন করে তাদের জীবিকা অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। এরাও প্রথম পর্বে নদীতে ভেসে আসা মৃত প্রাণীর দেহ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জনের উপরে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ মৃত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণী স্রোতের টানে নদী দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় এরা সেগুলিকে তুলে তাদের ছাল ছাড়িয়ে শুকনো করে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। এটাই ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। এই কারণে এরা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করে। কারণ এর ফলে তারা সহজে নদী দিয়ে কিছু ভেসে গেলে দেখতে পাবে, এবং নদীর উপর লক্ষ্য রাখতে পারবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের এই চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। অনেক মুচি পরিবার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পেশা বেছে নিয়েছে। তবে একদিন এই

মৃত প্রাণীর চামড়া সংগ্রহ করা ছিল এদের একমাত্র পেশা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রায় ৫০ হাজার 'দাস' সমাজের মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে।[৪৫] সুন্দরবনের অন্যান্য জীবিকার মত লবণ বা নুন প্রস্তুতও একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা ছিল। বর্তমানে আমরা খুবই মিহি সাদা ধবধবে লবণ ব্যবহার করে থাকি। একসময় সুন্দরবন তথা সমগ্র ভারতবর্ষের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ঘরে ঘরে লবণ তৈরি হত। ইংরেজদের লবণ ব্যবসা এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, যার ইতিহাস সকলের জানা। এখনও এই অঞ্চলের অনেক পরিবার শীতের সময় নদীর ধারে লবণ তৈরি করে। কিন্তু এই লবণ তৈরির পরিমাণটা পূর্বের তুলনায় অনেক কম।[৪৬]

সুন্দরবনবাসীর নদীকেন্দ্রিক জীবিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সুন্দরবন ভ্রমণ ও পর্যটন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্য যে কোনো স্থানের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য দেশের সাথে সাথে বিদেশ থেকেও অনেক পর্যটকদের আগমন ঘটছে যা পর্যটন শিল্পের সাথে সাথে সুন্দরবনবাসীর জীবনেও দারুণ প্রভাব ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকা অতুলনীয়। কারণ সুন্দরবনের পরিবহণের মাধ্যম নদী। সেজন্য সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য নদীপথ একমাত্র ভরসা। ফলে এই পর্যটনের সাথে যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের অনেক মানুষ তাদের জীবনধারণের একটি পথ খুঁজে পেয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায় যে, ২০১০ সালে ৮৯ হাজার ৪১৭ জন, ২০১১ সালে ৯৪ হাজার ৫৮২ জন, ২০১২ সালে ৯৭ হাজার ৪১৭ জন পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিলে।[৪৭] অর্থাৎ সুন্দরবনের প্রতি যে একটা আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে সুন্দরবনে পর্যটকের আকর্ষণ বাড়লে সুন্দরবনের সাথে সাথে রাজ্যের অর্থনীতিরও মানোন্নয়ন ঘটবে। ভ্রমণের ফলে সুন্দরবনের প্রাচীন ঐতিহ্যকে

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ দেশ বিদেশের ভ্রমণকারীরা সুন্দরবনের লোক-সংস্কৃতির আনন্দকে উপভোগ করতে চায়। সেজন্য পর্যটনের হাত ধরে সুন্দরবনের অনেক পুরানো ঐতিহ্য আজও বর্তমান। সুন্দরবন ভ্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু নদীকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা। অর্থাৎ নৌকা, ভটভটি, লঞ্চ, প্রভৃতি। সুন্দরবন ভ্রমণের মান উন্নয়নের স্বার্থে নৌকা, ভটভটির সচল থাকা অতি আবশ্যক। কারণ এরসাথে সুন্দরবনের ভ্রমণ ও সুন্দরবনবাসীর জীবিকা দুটোই জড়িত। সুন্দরবন একটি নদীকেন্দ্রিক ভূখণ্ড। শিরা উপশিরার মত চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে নদী। নদী ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমাদের একটি ধারণা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত যে, সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া সুন্দরবনবাসীর অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়বে। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সুন্দরবনবাসীরা প্রথমে নৌকা, সালতির মত ছোটো মাপের কাঠ দিয়ে বানানো নদীযান ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। তখন এই সালতি ও নৌকা ছিল সুন্দরবনবাসীর কাছে নদীকেন্দ্রিক পরিবহণের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম।[৪৮] সুন্দরবনের নদীতে বহু প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি পাওয়া যায়। জঙ্গল কাঠ, মধু, মোম, গোলপাতা প্রভৃতি সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই যারা মাছ ধরা ও জঙ্গল থেকে কাঠ, মধু, সংগ্রহ করার জীবিকাকে বেছে নিয়েছিল, তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে নদী যান নৌকাকে দেখা হয়। সুন্দরবনের পূর্ববর্তী নদী যানের মধ্যে "পালতোলা নৌকা" খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়াও ভটভটি, লঞ্চ, স্টিমার, বজরা, পানসি, নামক জলযানের দ্বারা সুন্দরবনের পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। গোসাবা থেকে ভটভটি করে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা:

সময়	গন্তব্য
ভোর ৪.৩০	বাসন্তী-সোনাখালী
ভোর ৫.০০	ক্যানিং
ভোর ৫.৩০	বাসন্তী-সোনাখালী
সকাল ৬.১৫	ক্যানিং
সকাল ৯.১৫	ন্যাজাট
সকাল ১০	দুনিয়ার মুখ (বালি বিজয় নগর)
সকাল ১০.৩০	আমলামেথী পেয়ারা তলা
সকাল ১১.৪৫	দুনিয়ার মুখ (বালি বিজয় নগর)
দুপুর ১২	আমলামেথী
দুপুর ১২.৩০	ঝড়খালী
দুপুর ১২.৪৫	আমলামেথী কলনী
দুপুর ১.০০	ফ্রেরারগঞ্জ
দুপুর ১.১৫	সাতজেলিয়া

*গোসাবা বোট ইউনিয়ান থেকে প্রাপ্ত, ২০০৯ সালের নথি

বর্তমানে ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। নদীবাঁধ নির্মাণ হচ্ছে। পূর্বের নদীযান তার গুরুত্ব একটু হলেও হারাতে শুরু করেছে। তবে এখনও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার জন্য নৌকার উপর নির্ভর করতে হয়।

সুন্দরবনের মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠানেও নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের সবথেকে বিখ্যাত মেলা হল গঙ্গাসাগর মেলা। গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থান তীর্থভূমি গঙ্গাসাগর। ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গঙ্গাসাগর সঙ্গম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মহাতীর্থ। অতি প্রাচীনকাল হতেই অধ্যাত্ম পথের সাধক, মুনিঋষি, সাধুসন্তগণ গঙ্গার তটভূমিতে আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের পরম প্রাপ্তি লাভ করেছেন। অগণিত মঠ, মন্দির, দেবালয়, তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে গঙ্গার উভয়তীরে। গঙ্গাতীরে যাগযজ্ঞ-, শাস্ত্রপাঠ, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধ কৃত্য, দেবতা পূজন যা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তা কোটিগুণ ফল প্রদান করে। তাই গঙ্গার পবিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে পরমাকর্ষণে সাধু সন্তরা আশ্রয় গ্রহণ করেন গঙ্গার পুণ্য তটভূমিতে। মহর্ষি কপিল দেবের সাধনার পাদপীঠ গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এই সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র সাধুসন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের এক মহান তীর্থস্থান। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে অবস্থিত নদী ও সমুদ্র বিধৌত নিম্নভূমিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমে এই সঙ্গমে। সুন্দরবনের সীমানা ছাড়িয়ে এই মেলা এখন ভারত বিখ্যাত মেলায় পরিণত হয়েছে।[৪৯] হিন্দুদের কাছে এই মেলা দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা (কুম্ভমেলার পর)। সুন্দরবনের আরও একটি নদীকেন্দ্রিক মেলা হলো উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামের পির গোরাচাঁদের মেলা। এই মেলা প্রতিবছর ১১ থেকে ১৪ ফাল্গুন পর্যন্ত হয়। জাতি, ধর্ম ভুলে সকলে একসাথে মিলেমিশে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই মেলার বিস্তার বিদ্যাধরী নদীর তীরে। বিদ্যাধরী নদীর পারে 'মাজার', আর ওই মাজারকে কেন্দ্র করে দু-পারেই মেলা বসে।[৫০] ক্যানিং সুন্দরবন মেলা খুবই জনপ্রিয় একটি আঞ্চলিক মেলা। ক্যানিং অঞ্চল ছাড়াও পাশাপাশি এলাকা থেকে বহু মানুষ

এই মেলায় উপস্থিত হয়। এই মেলা মাতলা নদীর চরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। এছাড়াও সুন্দরবনের বাসন্তী থানার মসজিদবাটি অঞ্চলের মোকামবেড়িয়ার বাবা বড় কাছারির মেলা খুবই জনপ্রিয় ও বিখ্যাত একটি হিন্দু মেলা। যদিও এই মেলায় সমস্ত ধর্মের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিব ঠাকুরের পুজো করা হয়। স্থানীয় ভাষায় শিব ঠাকুরের এই মন্দিরকে বাবা বড় কাছারির থান বলা হয়। বিদ্যা নদীর একটি শ্মশানকে কেন্দ্র করে এই মন্দিরের অবস্থান। সূচনার সাল তারিখ সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না।

সমগ্র সুন্দরবনে মেলা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন যেহেতু নদী ও জঙ্গলাকীর্ণ সামুদ্রিক ভূখণ্ড সেজন্য বনের দেবী মা বনবিবির পুজো উপলক্ষে সুন্দরবনের অনেক স্থানে সুন্দরবনবাসীর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মা মনসার ভাসান, দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রতিমা ভাসান উৎসব, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, পিঠেপুলি উৎসব, নবান্ন উৎসব, সুন্দরবনের সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য সুন্দরবন লোকপ্রিয় উৎসব ইত্যাদিও জনপ্রিয়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সুন্দরবনের নদনদী শুধুমাত্র সুন্দরবনের কল্যাণ সাধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তা অঞ্চলের সাথে সাথে সারা দেশের জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক বাতাবরণ উন্নত করে তুলতে সর্বত ভাবে সাহায্য করেছে। এই আলোচনা থেকে আমরা সুন্দরবনের নদীকেন্দ্রিক সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে জানতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals (New York: Routledge, 2017), p- 164

২. Amitav Ghosh, The Hungry Tide (New York: Harper Collins, 2005), p- 252

৩. দৈনিক ইত্তেফাক (পত্রিকা), ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৫ মার্চ, ২০১৬

৪. ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গ্রন্থন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ- ২১

৫. স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী-১ (কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয় ১৪১৮), পৃ- ৭১

৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮), পৃ- ৭

৭. তদেব, পৃ- ১০

৮. তদেব, পৃ- ৭৮-৭৯

৯. তদেব, পৃ- ৪১

১০. তদেব, পৃ- ৭১

১১. দয়ালচাঁদ সরকার, বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে নদ-নদী (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, ২০১৬), পৃ- ৯৭

১২. অদ্বৈত মল্লবর্মন, তিতাস একটি নদীর নাম (কলকাতা: পুঁথিঘর, ১৪১৮, পৃ- ৩৪৫

১৩. তদেব, (ভূমিকা)

১৪. বিমল, চক্রবর্তী, অদ্বৈত মল্লবর্মনঃ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার (ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ- ৪২৪

১৫. শুভঙ্কর ঘোষ, নীল লোহিত- বিশেষ নদী সংখ্যা, নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ- ১৪৩

১৬. দৈনিক সংগ্রাম, (পত্রিকা), ঢাকা, বাংলাদেশ, ৪ এপ্রিল, ২০১৪

১৭. শুভঙ্কর ঘোষ, নীল লোহিত- বিশেষ নদী সংখ্যা, নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ- ১৪১

১৮. ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গ্রন্থন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ- ১১০- ১১১

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৬

২১. অরবিন্দ সামন্ত, "সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য তিস্তাপারের বৃত্তান্ত: একটি সমীক্ষা", উত্তরধ্বনি (পত্রিকা), শারদ সংখ্যা ১৪০৯, পৃ- ৬০৬

২২. ইন্দ্রাণী ঘোষাল, বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস (দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গ্রন্থন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ- ১১২

২৩. দেবজ্যোতি মণ্ডল, সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য (, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন ২০১৬), পৃ- ৭৪

২৪. তদেব, পৃ- ৯৭

২৫. দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৫), পৃ- ৫৫৩-৫৬

২৬. দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃ- ৩৫৯

২৭. নীল লোহিত- বিশেষ নদী সংখ্যা, নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ- ২১২

২৮. তদেব, পৃ- ২১৫

২৯. নীল লোহিত- বিশেষ নদী সংখ্যা, নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ- ১৬০-১৬১

৩০. তদেব, পৃ- ১৬৯

৩১. তদেব, পৃ- ১৭০-৭১

৩২. তদেব, পৃ- ১৭৭

৩৩. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতা: ছোঁয়া, ২০২১), পৃ- ২৮৭

৩৪. তদেব, পৃ- ২৮৭

৩৫. জয়দেব দাস এবং অমল নায়েক, অজানা সুন্দরবন (, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: চম্পা মহিলা সোসাইটি, ২০১৫), পৃ- ৮৩

৩৬. Clark john (art), 'A Social Ecology', (Anarchy Archives), http://library.nothingness.org/articles/anar/en/display/303 Retrieved on 20.07.2022, Retrieved on 20.07.2022

৩৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব(প্রথম পর্ব) (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৩৮৬), তৃতীয় সংস্কার, পৃ- ৯১।

৩৮. Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760 (Delhi: Oxford University Press, 1997) p- 3

৩৯. দেবপ্রসাদ জানা, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ- ৩২-৩৭

৪০. ক্ষেত্র সমীক্ষা: গোলাম হোসেন, বাসন্তী, ইটাভাটি, বয়স- ৫৫, পেশা- মাঝি

৪১. এ. এফ. এম. আবদুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস (বাংলাদেশ: লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন, ১৯৬৭), পৃ. ২৭৯

৪২. মালবিকা গোস্বামী, সুন্দরবনের জীবন, জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, ২০০০) পৃ- ১৬৭

৪৩. ক্ষেত্র সমীক্ষা: রঞ্জিত মণ্ডল, গোসাব, বিজয়নগর, বয়স- ৫০, পেশা- নদীতে কাঁকড়া ও মাছ শিকার

৪৪. ভরত মণ্ডল, গোসাবা, বিজয়নগর, বয়স- ৫০, পেশা- জঙ্গল থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহ

৪৫. নিম্ন গাঙ্গেয় সংস্কৃতি পত্র, কলকাতা, নবম সংখ্যা, জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৬

৪৬. শশাঙ্ক মণ্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, (কলকাতা: পুনশ্চ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ- ৩১

৪৭. অনুকূল মণ্ডল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (কলকাতা: দেসী বুক এজেন্সি, ২০১৪), পৃ- ৮৮

৪৮. ক্ষেত্র সমীক্ষা: হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গোসাবা, বিজয়নগর, বয়স-৮৫, পেশা- কৃষক।

৪৯. শচীন দাস, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ- ১১৩

৫০. মলয় দাস, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি (কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১), পৃ- ৮৬।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের আলোকে সুন্দরবনের নারী

নারী ও পুরুষ সকলের অবদান সমান। নারীকে বাদ দিয়ে যে কোনো সভ্যতার মানোন্নয়নের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নারীরাই সমাজে অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে নারীরা অবহেলিত ও শোষিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার জাঁতাকলে নারীদের দিন রাত শোষণ করা হচ্ছে। সামাজিক নানা বাধা যেমন- কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, লিঙ্গ বৈষম্য, নিপীড়ন, শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদির ফলে নারীদের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিভার বিকাশ করা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। উপনিবেশিক মননে Man বা Manly বলতে পুরুষকেই বোঝানো হয়। আর নারীদের জন্য Woman শব্দটি বরাদ্দ হয়। নারী থেকে গেল পুরুষ নির্মিত লিঙ্গবৈষম্যের সহজাত বোধ ও ধারণার মধ্যে। যাদের একমাত্র পরিচয় সন্তান উৎপাদন, ক্রীতদাসী, সেবিকা ও রক্ষিতার ভূমিকায়। এছাড়া নারী যখন বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধনের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে নেয় তখন তারা স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পুরুষসমাজ নারীকে লোভনীয় ভোগ্যপণ্যের দৃষ্টিতে দেখত। দীর্ঘ মানবসমাজের ইতিহাসে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো এমন একটি সামাজিক রূপরেখা নির্মাণ করল যেখানে পুরুষ ভাবল আবহমানকাল ধরে নারীদেহ স্বাচ্ছন্দে ভোগ করা যায়, শারীরিক নির্যাতন করা যায়, যৌন অত্যাচার করা যায়।[১] এখনও পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনেক গোষ্ঠী মনে করে বাড়ির মেয়ে, বউদের কাজ শুধুমাত্র রান্না করা, খাওয়ানো, সন্তান পালন, আর সব কথা মেনে

চলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে নারীজাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করলে অন্য কেউ মুক্তি দিতে পারে না'।[২] কিন্তু নারীদের প্রতি এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল দেশভাগজনিত বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ে। দেশভাগের মধ্যে দিয়ে নারীরা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। এই প্রথম মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রেখেছিল স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে। এমনভাবেই ধীরে ধীরে স্বাধীনোত্তর পর্বে নারীরাও সমাজ জীবনে পুরুষদের সাথে সমান সারিতে চলতে আরম্ভ করেছিল, যার জলন্ত উদাহরণ হিসাবে সুন্দরবনের নারীসমাজকে উল্ল্যেখ করা যায়। সুন্দরবনের ক্রমাগত সাফল্য ও উন্নয়নের পেছনে সুন্দরবনের নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারীর স্বনির্ভরতা ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই আমার আলোচ্য অধ্যায়ের বিচার্য বিষয় হল 'সুন্দরবনের নারীদের জীবন সংগ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা এবং সেই বাধা সত্ত্বেও কিভাবে তারা সুন্দরবনের ইতিহাসে তাদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে ও সুন্দরবনের উন্নয়নে কিভাবে নিজেদের অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে সেটার বিশেষণ করা'।

সুন্দরবনের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় নারীদের জীবন সংগ্রাম

প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় নারীদের সংগ্রাম একটি আলোচিত এবং বেদনাদায়ক ইতিহাস। সুন্দরবনের অগ্রগতি ও উন্নয়নে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই অঞ্চলের সমাজজীবনে নারীদের প্রতি হয়ে চলা নির্যাতন, বৈষম্য, এবং অবহেলা ভাগ্য বিড়ম্বিত একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে, যে অধ্যায়ের প্রতিটি পর্বেই সংকট, যার থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। দুর্যোগ-বিপর্যয়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাংসারিক সমস্ত দায়ভার নারীদের বহন করতে হয়। অর্থাৎ পুরুষবিহীন সংসারে নারী হয়ে ওঠে পরিবারের প্রধান। অথচ

সমাজজীবনে নারীদের এই দায়বদ্ধতার কোন মূল্যই নেই। তাই সামাজিক স্বীকৃতি ও মূল্য ছাড়াই নারীরা জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে শামিল হয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সামাজিক অসম্মানের থেকে মুক্তি লাভের জন্য নারীরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। দারিদ্রগ্রস্ত সংসারে তারা আরও নিষ্পেষিত। শিক্ষা নেই, কোন কিছুর দক্ষতা নেই, কোন আর্থিক সংগতি নেই অর্থাৎ আর্থিক পরাধীনতা, পরিপূর্ণ পরনির্ভরতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের শিকার হয়ে এক দূষিত বাতাবরণে জীবনধারণ করে এই অঞ্চলের নারীরা।[৩] জীবনের এই দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে নারীরা মাঠে, ঘাটে, খালে নানা ধরণের কাজের মধ্যে নেমে পড়েছে। সুন্দরবনের জীবিকার ৮৫ শতাংশ নির্ভর করে কৃষিকাজের উপরে। কারণ এখানকার ৯৫ ভাগ জমিই ফসলা। ফলে বছরে ১২০ থেকে ১৩০ দিন কৃষিকাজে খেত মজুরদের কাজ চলে। ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার নারীর মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী কৃষিকর্মের সাথে যুক্ত। এছাড়া সুন্দরবনে নারীশিক্ষার হার ২ শতাংশ, আর এই অঞ্চলে বড় ধরণের কোন কলকারখানা না থাকার ফলে কর্মসংস্থানের জন্য নতুন কোন সুযোগের সম্ভাবনা তৈরি হয় না।[৪] সুন্দরবনের বেশিরভাগ নারীরা নানা ধরণের ফসল রোপণ, পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগ্রহের কাজ করে। বিশেষত ধান রোপণ, ধান কাটা, ধান ঝাড়ার কাজ করে। মহিলাদের পারিশ্রমিক দৈনিক মাথা পিছু ৫ থেকে ৮ টাকা। যদিও বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় সুন্দরবনের গড় মাথাপিছু দৈনিক মজুরি ৪-৫ টাকা থেকে বেড়ে ১২ টাকায় পরিণত হওয়া অনেকাংশে সফলতা পেয়েছিল।[৫] এই অঞ্চলে পৌণ্ড্র, আদিবাসী ও সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির বাসস্থান। এই সমস্ত শ্রেণির মানুষেরা একটু বেশি প্রাচীনপন্থী পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। ফলে আধুনিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটলেও প্রাচীন ভাবাদর্শ থেকে এরা মুক্ত হতে পারেনি। গ্রাম্য নারীদের মধ্যেও এই ভাবাদর্শের প্রভাব

সবথেকে বেশি। লৌকিক দেবতা, গ্রাম্য ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক, ওঝা-গুনিন, মন্ত্র ইত্যাদিতে আস্থা এই অঞ্চলের নারীদের স্বনির্ভরতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনের নারীদের সবথেকে বড় সমস্যা হল জীবিকার সমস্যা। পারিবারিক অচলাবস্থা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সন্তান পালন, সংসারের কাজ ছাড়াও নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের বাড়ির বাইরে বার হতে হয়েছিল। তারা জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসাবে নদী ও জঙ্গলকে বেছে নিয়েছিল। নদীতে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরার সাথে এই অঞ্চলের অধিকাংশ নারীরা যুক্ত থাকে। বাগদা চিংড়ির পোনাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'মীন' বলা হয়।[৭] বছরের ৮/৯ মাস এই মীন ধরার কাজ চলে। সারাবছর এই মীনের বাজার দর ওঠা-নামা করে। ১০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত দরেও বিক্রি হয়। নারীরা এই কাজের জন্য জলের কুমীর, রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে জীবিকা অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদীতে মীন ধরার পাশাপাশি সুন্দরবনের নারীরা আরও নানা ধরনের জীবিকার সাথে যুক্ত। যেমন- মাদুর বোনা, মুড়ি ভাজা, গজ-ব্যান্ডেজের কাপড় তৈরি, মশারির কাপড় তৈরি, তাঁতের কাজ ইত্যাদি।[৮] সুন্দরবনের হাসনাবাদের মুড়ি বিখ্যাত। এই অঞ্চলের মহিলাদের তৈরি মুড়ি কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের ২৯শে নভেম্বরের ২৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় ও ২০০৯ সালের ২৫শে মে, আয়লার বিপর্যয়ের পর সুন্দরবনের নারীদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম একটু অন্য ধারায় চালিত হয়েছিল। ঐ সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সুন্দরবনের সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কর্মের সন্ধানে পুরুষরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় পুরুষবিহীন পরিবারের চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে নারী। অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সাথে সাথে পুরুষবিহীন সংসারে হাট বাজার, সন্তানদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, ঘরবাড়ি,

গৃহপালিত পশু, সমস্ত কিছুই সামলাতে হয় নারীকেই। এমনভাবে পিছিয়ে পড়া নারীসমাজ নতুনভাবে ধরা দিয়েছে সুন্দরবনের সমাজ জীবনে।[৯] সুন্দরবনের অন্যান্য জীবিকার মত লবণ বা নুন প্রস্তুতও একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। বর্তমানে আমরা খুবই মিহি সাদা ধবধবে লবণ ব্যবহার করে থাকি। একসময় সুন্দরবন তথা সমগ্র ভারতবর্ষের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ঘরে ঘরে লবণ তৈরি হত। ইংরেজদের লবণ ব্যবসা এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, যার ইতিহাস সকলের জানা। এখনও এই অঞ্চলের অনেক পরিবার শীতের সময় নদীর ধারে লবণ তৈরি করে। কিন্তু এই লবণ তৈরির পরিমাণটা পূর্বের তুলনায় অনেক কম। লবণাক্ত মাটি থেকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লবণ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। সুন্দরবনে সাধারণত নদীর পাড়ে বোটে তৈরি করে লবণ প্রস্তুত করা হত। অর্থাৎ নদীর পাড়ে কোদাল দিয়ে চারকোনা করে মাটি কেটে চৌকা করে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে তার উপর নদীর পাড়ের ধুলো ভর্তি করে জল দেওয়া হয়। ওই জল খুব ধীরে ধীরে চৌকা সংলগ্ন ছোটো গর্তে ছিদ্র পথে আসে। আর ওই জল ফুটিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হয়। এইভাবে এই অঞ্চলের নারীরা নিজেদের খাওয়ার জন্য এবং ব্যবসার চাহিদা মতো প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করত।[১০]

সুন্দরবনের নারীদের সঠিক অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা। কারণ এই অঞ্চলের নারীদের সংগ্রামের ইতিহাস তেমনভাবে প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ পায়না। তবে এই অঞ্চলের নারীদের সঙ্কটের মূল কারণ বাল্যবিবাহ। ২০১১ সালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মেয়েদের বিবাহ ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে হয়ে যায়। দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, এবং বাল্যবিবাহ নারীদের পিছনের সারিতে ঠেলে দিচ্ছে। এই এলাকার নারীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ হওয়ার

বহু আগে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। এক গৃহবধুর কথায় তার সংগ্রামের কাহিনীটা ঠিক এমন-

> "১২ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। লোকের বাড়ি জনমজুর খাটিছি। জমিতে ধান রুয়েচি। অভাবের কথা কী আর কব। খুব অভাব। ধনী বাড়ির মেয়ে ছেলাম। স্বামীর জমি ছিল। তারপর স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজনরা জমি ফাঁকিফোক্কড় দে ন্যালে। ভোরে ছড়া-ঝাঁটি দেতাম। গইলির গোবর গোটা করে পা দে চটকাতাম। তারপর ঝুড়িতে ভরে চামটায় নিয়ে ঘুঁটে দেতাম। ঢেঁকিতে ধান ভানতাম, চাল কুঁড়াতাম। তখন আতপ চালই সবাই খেত। ঘোমটা দেতাম না আবার! পথ দেখতি পাতাম না। হিঙ্গলগঞ্জের ওদিকে ধপধপি-র পুকুর থেকে জল এনে খাতাম। জল আনতে যাতাম সকালে আর রাঁধার সময় বাড়ি আসতাম"।[১১]

সরকারি নথির উপরে ভিত্তি করে যেভাবে দেশের অন্য জায়গায় নারীদের অবস্থান নির্ণিত হয় সেই ভিত্তিগুলি কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কারণ এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান অন্য যে কোন স্থানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর হাতছানি, সেই মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে জীবিকার সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই অঞ্চলের নারীসমাজ।

নারীদের অবস্থার উন্নয়নে শিক্ষার অভাব

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের জীবন, জীবিকা, বিপর্যয় নিয়ে বিভিন্ন লেখক, গবেষক, সমাজসেবীদের মধ্যে আলোচনা গুরুত্ব পেলেও এই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেমনভাবে আলোচনা হতে দেখা যায়নি। সুন্দরবন সৃষ্টির আদিকাল থেকে সবথেকে বঞ্চিত এই

এলাকার নারীসমাজ। সামাজিক মর্যাদাহীনতার সাথে সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষনীয়। উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে প্রান্তিক দারিদ্র পরিবারের মেয়েরা একেবারেই বঞ্চিত। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাগুলোতে এখনও কোনো কলেজ তৈরি হয়নি। ফলে দূর শহরে বা শহরতলিতে পড়াশোনা করতে যাওয়ার খরচ চালানোর ক্ষমতা বা পড়তে পাঠানোর মানসিকতা অধিকাংশ পরিবারের নেই।[১২] এই নিরক্ষরতার ফলে সুন্দরবনের বহু নারী কর্মহীন। জীবনধারণের জন্য নদী ও বনকেন্দ্রিক জীবিকা অর্জনের পরিবর্তে অন্য কোনো সম্মানজনক জীবিকা অর্জনের ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার ফলে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিক্ষা শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের মাধ্যম নয়, শিক্ষা সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জাতপাত, লিঙ্গবৈষম্য এবং নিপীড়িত নারীদের মধ্যে আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই সুন্দরবনের নারীদের অবস্থার উন্নয়নে শিক্ষার বিকাশ ঘটানো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ, কিন্তু নিরক্ষরতা এই এলাকার নারীদের অবস্থার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।[১৩] নারীর যোগ্য সম্মান ও ক্ষমতায়নে শিক্ষার অবদান সবথেকে বেশি, কিন্তু এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে সুন্দরবনের নারীসমাজ। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে কেন পিছিয়ে আছে সেটাই বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীকে অর্থনৈতিক কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। বলা চলে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সুন্দরবনের ৯০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। সুতরাং যে সমস্ত পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র সীমার নীচে সেই পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ পায় না। তাদের অল্প বয়স থেকে পারিবারিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া একই সাথে জন্ম নেওয়া ছেলে-মেয়ের প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। যে পরিবারে

একাধিক সন্তান সেই পরিবারের মধ্যে একটি আদিম ধারণা লক্ষ্য করা যায়। ধারণাটি হল- ‘মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি লাভ? মেয়েরা বিয়ে করে অন্য বাড়ি চলে যাবে, তাই ওদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ খরচ হবে সেটা পরিবারের কাজে ব্যয় করলে পরিবারের উন্নতি হবে। তাই শুধু শুধু মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে’।[১৪] পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য যে উৎসাহ দেখা যায়, সেই উৎসাহ যদি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যেত তাহলে সুন্দরবনের নারীদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়ে যেত। এছাড়া একাধিক সন্তানদের শিক্ষার যে ব্যয়ভার, সেটা থেকে মুক্তির জন্য নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শিশুশ্রম এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও তলানিতে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। চরম দরিদ্র থেকে মুক্তির আশায় অল্পবয়স থেকে এখানকার শিশুরা কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কারণ এখানকার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই তারা আশা করে তাদের সন্তানরা একটু বড় হয়ে তাড়াতাড়ি তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করবে। ফলে শিশুদের মনে শিক্ষার প্রতি একটা অনীহা তৈরি হয় এবং লেখাপড়া ছেড়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব তৈরি হয়ে যায়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পরেই বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। কারণ এই সময়টাই শিশুশ্রমের উপযুক্ত সময়।[১৫] এই অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রধান বাধা ছিল বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের মূল কারণ সামাজিক রীতি। সামাজিক কুসংস্কার, রীতি, নীতি, অন্ধবিশ্বাস ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে বাল্যবিবাহের প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ এই প্রথাকে পারিবারিক আয়তন ও অর্থ কষ্ট

কমানোর উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সকলের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছিল যে, নারীদের শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলে পরিবারের বাড়তি অর্থব্যয় থেকে মুক্তি ঘটবে। কারণ তাদের ধারণা মেয়েদের জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র গৃহকর্ম, স্বামী সেবা ও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। তাই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার হার বাল্যবিবাহের দ্বারা বহুগুণ প্রভাবিত হয় সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার।[১৬]

সুন্দরবনের মতো এলাকাতে নারীশিক্ষা যেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর অন্যকিছু নয় এমন ধারণা ব্যক্ত করা হয় সেখানে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলে বহুনারী শিক্ষা থেকে দূরে চলে যায়। কারণ এই অঞ্চলে নব্বই শতাংশ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে, তাই তাদের কাছে নারীশিক্ষার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। ফলে পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হলে তাদের আর শিক্ষার সাথে থাকতে দেওয়া হয় না, তারা স্কুলছুট হয়ে যায়। এককথায় এই অঞ্চলের নারীদের জীবনে নানা ধরণের সমস্যা, সেই সমস্ত সমস্যাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়া এই অঞ্চলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে দূরত্ব একটা প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুন্দরবন একটি দুর্গম এলাকা। বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে স্কুলের সুবিধা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ফলে কম করে ৩-৪ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে স্কুলে আসতে হত। কারণ এখানে সাইকেল বা অন্য কোন পরিবহণের সুবিধা ছিল না। তাই একটা সময় পরে পরিবারের লোকেরা বাড়ির মেয়েদের এতটা দূরে একা একা স্কুলে যেতে দিতে সাহস পায় না, যার ফল স্বরূপ তাদের স্কুল থেকে দূরে সরিয়ে গৃহকর্ম শেখায় উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়া নারীশিক্ষার বাধা স্বরূপ পারিবারিক বাধা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাবা-মায়েরা

যদি নিজেরাই অশিক্ষিত হয় তারা কখনই শিক্ষার গুরুত্ব দেবে না। ফলে তারা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। নারীদের প্রতি পরিবারের এই আশা- আকাঙ্ক্ষা ও ভরসার অভাব তাদের অশিক্ষার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুন্দরবনের নারী সাক্ষরতার হারকে একটি পরিসংখ্যান দ্বারা তুলে ধরে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলাম।[১৭]

ব্লক	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিঙ্গলগঞ্জ	৩৭.২১	৫৮.২	৬১.৬৪
সন্দেশখালি-১	২৩.৫৩	৪৬.২	৫৫.২
সন্দেশখালি-২	২৫.৯	৪৬.৮	৫৩.৯
হাসনাবাদ	৩৪.৫১	৫৪.৪	৫৮.১
মিনাখা	২৬.৫	৪৭.২	৫৬.১
গোসাবা	৩৮.৫	৫৬.৬	৬৩.১
বাসন্তী	২৪.১	৪৪.৩	৫১.৫

বিধবা ও অসহায় মহিলাদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস

সুন্দরবন একটি বিপদসঙ্কুল এলাকা, কিন্তু জীবিকা সংগ্রহের কারণে জঙ্গল সংলগ্ন প্রতিটা পরিবার কোনও না কোনও ভাবে সুন্দরবনের সম্পদের উপরে নির্ভরশীল। ফলে এই এলাকার বহু জঙ্গলজীবী মানুষকে বাঘ, কুমীর, হাঙর, সাপের কামড়, নৌকা দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুন্দরবনের এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা এতবেশি যে, ঐ গ্রামগুলোকে "বিধবা পাড়া" নামে অভিহিত করা

হয়েছে।[১৮] সুন্দরবনে অলিতে গলিতে এমন অনেক বিধবা পাড়ার অস্তিত্ব বর্তমান। ২০০৯ সালের পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর শুধুমাত্র বাঘের আক্রমণে নিহত হয় প্রায় ৪০ জন জঙ্গলজীবী মানুষ।[১৯] সরকারি তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতি বছর সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে গড়ে ১০-১৫ জন মানুষেরে মৃত্যু হয় বাঘের আক্রমণে।[২০] এখনও পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে নিহত পরিবারে বিধবার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।[২১] একমাত্র পুরুষদের উপরে নির্ভরশীল পরিবারে হঠাৎ করে ঐ উপার্জনকারী মানুষটার মৃত্যু হলে পরিবারের যে কী অবস্থা হয় সেটাই আলোচ্য প্রেক্ষাপটের মূল বিচার্য বিষয়। সুন্দরবনের বিধবাদের ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা ও আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটা মারা গেলে সেই পরিবারটি কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তাদের কি মুক্তির উপায় নেই? সরকার কি কোনভাবে এই পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না? এমন অনেক প্রশ্ন আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়। সরকার নিশ্চয়ই সাহায্য করে, কিন্তু সেই সাহায্য পায় কত জন? এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন। মৃত পরিবারকে যদি সরকারি সাহায্য পেতে হয় তাহলে সরকারি শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলোর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল নিহত ব্যক্তির শবদেহ বনদপ্তরের আধিকারিকদের সামনে উপস্থিত করতে হয়। তবেই ডেথ সার্টিফিকেট ও পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দেহকে উদ্ধার করতে হবে, দেহ উদ্ধার না করতে পারলে সরকারি সাহায্য পাওয়া যাবে না।[২২] অনেক সময় দেহ উদ্ধার করতে না পারলে বনদপ্তরে আবেদন করলে, আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু সুন্দরবনের জঙ্গল একটা ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল এলাকা তাই এই প্রক্রিয়া তেমনভাবে কার্যকরী নয়। সরকারী সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সেটা হল শুধুমাত্র মৃতদেহ উদ্ধার

করলেই কিন্তু সাহায্য পাওয়া যাবে না, নিহত ব্যক্তির জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিপত্র বা পারমিটও লাগবে। এই পারমিট সংক্রান্ত সমস্যার কারণে অধিকাংশ জঙ্গলজীবী মানুষ তাদের সাহায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। পারমিট থাকা সত্বেও অনেক সময় সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় না, কারণ যদি কোনো মৎস্যজীবী বা জঙ্গলজীবী সংরক্ষিত বনের মধ্যে ঢুকে বাঘের আক্রমণে, কুমিরের আক্রমণে বা অন্য যে কোন কারণে মারা যায়, তাহলে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। কারণ তারা সংরক্ষিত বনে ঢুকে বেআইনি কাজ করেছে।[২৩] এমনভাবে নিয়মের জালে আবদ্ধ হয়ে সুন্দরবনের দরিদ্র জঙ্গলজীবীরা সরকারি অনুদান পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ঐ পরিবার বা ঐ বিধবার জীবনে নেমে আসছে অন্ধকার। কঠিন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সুন্দরবনের বিধবাদের নিয়ে আমার ক্ষেত্র সমীক্ষার কিছু তথ্য তুলে ধরছি। এই সমীক্ষায় আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, এই অঞ্চলের বিধবাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের প্রতি সামাজিক অমানবিকতার চিত্র। সেই সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে দিয়েও তারা কিভাবে নিজেদের জীবন সংগ্রামে টিকে থেকে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন কোন পথ বেছে নিয়েছে সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছি।

নাম- ময়না সাহা, বয়স- ৭২, বর্তমান বাসস্থান- ক্যানিং, পূর্বের বাসস্থান- কুমিরমারী। বর্তমানে সবজি বিক্রেতা। ১৯৪৭ সালে ওপার বাংলা থেকে দেশভাগের জন্য এপার বাংলায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। খুব অল্প বয়সে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সুন্দরবনে আসার পর ময়না সাহার স্বামী সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ- কাঁকড়া ধরার সাথে যুক্ত হয়েছিল। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান। তিনি আরও বলে যে, তাঁর স্বামীর জঙ্গলে যাওয়ার কোনো কাগজপত্র ছিল না, কারণ তখনও

পর্যন্ত এদেশীয় কাগজপত্র হয়নি। অর্থাৎ উদ্বাস্তু হিসাবে ছিল। তাই এই মৃত্যুতে সরকারীভাবে কোনো সাহায্য পায়নি ময়না সাহার পরিবার। স্বামীর মৃত্যুর পর এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সম্পূর্ণ সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে ময়না সাহার উপর। জীবিকার অবলম্বন হিসাবে বাবুদের বাড়ি 'কাজের মাসি' হিসাবে কাজ শুরু করে দুই ছেলে মেয়েকে বড়ো করে তোলে। দুই ছেলে মেয়ের এখন পৃথক সংসার, কিন্তু দুই সন্তান কেউ তাদের বৃদ্ধা মায়ের পাশে এসে দাঁড়াইনি। তাই শেষ অবলম্বন হিসাবে ক্যানিং বাজারে সব্জির ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে ৭২ বছর বয়সেও সহায় সম্বলহীনভাবে তিনি নিজের সংগ্রাম নিজেই করছেন।[২৪]

নাম- পুস্পা গায়েন, বয়স- ৬৫, বর্তমান বাসস্থান ক্যানিং, পূর্বের বাসস্থান মরিচঝাঁপি। বর্তমানে ক্যানিং মাছ বাজারের মাছ বিক্রেতা। ১৯৭৫ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর সামাজিক ও পারিবারিক নানা ধরনের অবিচার সহ্য করতে না পেরে একমাত্র সন্তানকে সাথে নিয়ে জীবিকার সন্ধানে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। তাঁর ভাষায় জীবনের অনেক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। সব থেকে বেশী যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল সেটা ছিল নিজের সম্মান হারিয়ে ফেলার ভয়। পুরুষ শাসিত সমাজে অসহায় নারীদের এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন সব সময়ই হতে হয়।[২৫]

এই প্রসঙ্গে শংকর কুমার প্রামাণিক মহাশয়ের গবেষণার কথা তুলে ধরে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে সুন্দরবনের বিধবা সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে। শংকরকুমার প্রামাণিক পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট দ্বীপের সত্যদাসপুর ও পশ্চিমদ্বারকাপুর আদিবাসী পাড়ায় শবর বিধবাদের জীবনসংগ্রামকে তাঁর বইয়ের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবনধারণের জন্য ওই অঞ্চলের বিবাহিত মহিলার বেশীরভাগই তাদের স্বামীদের সাথে জঙ্গলে যেতেন। জঙ্গলে গিয়ে বাঘের আক্রমণে তাদের অনেকের স্বামীদের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামী হারানোর শোক পালনের তেমন সুযোগই পায়নি। কারণ তাদের জীবনধারণের জন্য সেই জঙ্গলেই ফিরে যেতে হয়েছে। আরতি ভক্তা, কুসুম ভক্তা, সাবিত্রী ভক্তা, ভারতী মল্লিক, কাকলি মল্লিক নামের অসহায় বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম চলতেই থাকবে তাদের স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় এবং বিধবা অবস্থায়ও।[২৬]

বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে নারী স্বনির্ভরতা

সামাজিক দিক থেকে বিধবা মহিলাদের নানাভাবে নানা ধরণের বিধিনিষেধ দ্বারা আবদ্ধ করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিধবা মানেই সমাজের চোখে অপবিত্র, অশুচি। তাদের যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না। এমনকি ওই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোনো জিনিসে হাতও দিতে দেওয়া হত না। স্বামীর মৃত্যুর জন্য তাদেরকেই দায়ী করা হত। সমাজের পাশাপাশি নিজের পরিবারের লোকেরাও তাদের অমঙ্গলের প্রতীক মনে করত। তাই সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসাটা অনেকটাই কঠিন ও কষ্টের ছিল। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে এই অসহায় মহিলাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অনেকটাই ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো। যার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাঙ্গাবেলিয়ার মহিলা সমিতি এবং জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। এছাড়া ‘সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প’ এই অসহায় নারীদের

ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিল। এই প্রকল্পে ২২০ জন জেলে, বাউলিয়া, মউলি পরিবারের সাথে সাথে ২০ জন বিধবা নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০১১ সালের নথি পর্যন্ত দেখা গেছে যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাঁস-মুরগী পালন, শাকসবজি চাষ, ভেড়া-ছাগল চাষ প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে কৃষি, মাছ এবং প্রাণী সমস্ত বিষয়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ২০ জন বিধবা মহিলাকে বিনা মূল্যে আলাদা করে হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শী করে তোলা হয়েছিল, যাতে তারা নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।[২৭] মহিলাদের আত্মনির্ভরতা, লিঙ্গ বৈষম্যতা, পণপ্রথা, বধু নির্যাতন, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মতো সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়াতা বীণা কাঞ্জিলাল ১৯৪৬ সালে মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন। সুন্দরবনের নারী সমাজের মানসিক উন্নয়নের সাথে সাথে আর্থিক উন্নয়ন ভীষণভাবে দরকার ছিল। তাই নারীদের অবস্থার উন্নয়নকে সামনে রেখে তিনটি গ্রামের ৩৫জন সদস্যকে নিয়ে রাঙ্গাবেলিয়ার স্কুল ঘরে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ক্রমশ এই সমিতির কর্মধারা প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। বর্তমানে ৮টি ব্লকের ৩০০টি গ্রামে ৬০১১ জন সদস্যকে নিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই মহিলা সমিতির মধ্যে রয়েছে উইমেন্স ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার।[২৮]

ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টারে টেলারিং বিভাগে ১২টি সেলাই মেশিন, নীটিং সেন্টারে ৯টি মেশিনে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া ইনডাস্ট্রিয়াল কো-অপরেটিভ সোসাইটিতে ২৫টি তাঁত আছে। প্রোডাকশন সেন্টারে মহিলাদের টেলারিং, নীটিং, উইভিং, ব্লক ও বাটিক, প্রিন্টিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। এখানে এখনও পর্যন্ত ১৩৫৩ জন মহিলা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে ৪০টি

দুঃস্থ পরিবারের ৫২জন মহিলা সেন্টারে কাজ করে প্রতিমাসে ১২০০ টাকা থেকে ৩০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন করছে। প্রোডাকশন সেন্টারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি মহিলা সমিতির তিনটি বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এছাড়া শহরের মেলায় শোরুম ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই এর ব্যবস্থা করা হয়।[২৯] মহিলা সমিতি নির্দিষ্ট কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপ অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমকে পরিচালনা করে। পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ- ১. সর্বপ্রথম এই সমিতির সদস্য হিসাবে যোগদান করতে হবে। ২. গ্রামে গ্রামে স্বল্প সঞ্চয়ের দল গঠন করে স্বনির্ভর করে তোলা। এখনও পর্যন্ত ২১১টি স্বনির্ভর দল গঠন হয়েছে। ৩. দুঃস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনী সভার মাধ্যমে সমাজের সব স্তরের নারীদের সচেতনতার বিকাশ ঘটানো। ৪. ব্যক্তিগত পরিছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সুন্দরবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সচেতন করা। ৫. পণপ্রথা, বধু নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। ৬. সমাজের মহিলাদের আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও মহিলা সম্মেলন করা ইত্যাদি।[৩০] এমনভাবেই আরও নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দরবনের নারীদের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে এই মহিলা সমিতি।

ভারতী মণ্ডল, অপর্ণা মাইতি, সোনালী সাও, বীনা মণ্ডল, আখি সাও প্রমুখ মহিলা সমিতিতে কর্মরতা মহিলাদের সাথে কথা বলেছি তাদের মতে, "এই মহিলা সমিতির কারণে তাদের জীবনে নতুন করে আশার আলো ফুটেছে। তাদের অসহায় জীবনে একটু শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারা এখন কাজ করে দুইবেলা দুই মুঠো ভাত খেতে

পারছে। সম্মানের সাথে নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করতে পারছে"।[৩১] ভারতী মণ্ডল বললেন "তিনি সেলাই করে তাঁর সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালান। বড় মেয়েকে বিএড করিয়েছেন, ছোটো মেয়েকে এম.এ পাশ করিয়েছেন, ছেলেকে বি.এ পাশ করিয়েছেন। জমিহীন, চাষবাস নেই, শুধুমাত্র সেলাই করেই সংসার চালান। তাই তাদের কাছে এই মহিলা সমিতি মন্দিরের মত"।[৩২] স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি এই মহিলা সমিতি গ্রামের মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। জলবাহিত রোগ থেকে পরিবারকে কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করা যায় সেই বিষয়েও নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার ও নানা ধরণের ট্রাস্টের সহযোগিতায় এই সমিতি গ্রামে গ্রামে হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি বিতরণ করে, যাতে নারীরা সংসার জীবনের পাশাপাশি এই প্রাণী সম্পদ চাষ করে কিছুটা হলেও অর্থ উপার্জন করতে পারে।[৩৩]

সুন্দরবনের গরীব পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। মুড়ি, ধূপ, পশম বস্ত্র, সেলাই, পুতুল তৈরি, তাঁত, হস্ত ও যন্ত্র চিকন ইত্যাদি কুটিরশিল্পের উন্নয়নের দ্বারা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে। এই গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে বর্তমানে মুড়ি, সেলাই ও পশম বস্ত্র বোনাতে যথাক্রমে ৩২, ৪০, ৭৫ জন মহিলা যুক্ত আছে। এদের মাসিক আয় ৫০০-৩৫০০ টাকা। এছাড়া ধূপকাঠি তৈরি এবং পুতুল তৈরিও অনেক প্রসার লাভ করেছে। নিয়মত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত কাঁচামাল সরবরাহ এবং বাজারীকরণের মাধ্যমে প্রায় ১০০০ পরিবার নিজেদের স্থায়ী রোজগারের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং পরবর্তীকালে সুন্দরবনের স্কুলছুট বেকার যুবক-যুবতীদের কিভাবে কারিগরি দক্ষতায় পারদর্শী করে

বেকারত্ব দূরীকরণ করা যায় সে বিষয়েও একাধিক পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে।[৩৪] গরীব মানুষদের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে পশুপালন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। গত ছয় বছরে ২৪টি গ্রামের ২৮০০ জন মহিলা এই প্রকল্পের দ্বারা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এই প্রকল্পের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গ্রামে গ্রামে পশু পাখির মৃত্যুর হার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। যে সমস্ত এলাকাতে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় পরিবার পিছু বাৎসরিক আয় ৪২০০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। গ্রামে মুরগী ও হাঁসের সংখ্যা স্থায়ী ভিত্তিতে ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া এই প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিষেবা, ভ্যাকসিন দেওয়া, প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩৫]

সুন্দরবনের বিপর্যয়-পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে যায়। কারণ বিপর্যয়ের জন্য কৃষিকাজের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কমে যায়। ফলে কৃষিকাজের উপরে নির্ভরশীল অনেক পরিবারের কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় নারীদের উপরে অধিক চাপ পড়ে। কারণ বাড়ির পুরুষরা কর্মসংস্থানের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার ফলে গ্রামের কৃষিকাজ ও সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নারীদের উপরে এসে পড়ে। এখানকার নারীরা কৃষিকাজ ও খেতমজুরের কাজ খুবই দক্ষতার সাথে করতে পারে। যেমন ধান, সবজি, ডাল, উচ্ছে, লঙ্কা চাষে সুন্দরবনের নারীসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে ২০০৯ সালের আয়লা পরবর্তী অবস্থার কথা বলা যায়। খাদ্য উৎপাদন, ত্রাণ সংগ্রহ, পানীয় জলের যোগান, রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ ইত্যাদি সমস্ত কাজই নারীরা করেছে। এছাড়া আয়লা-

পরবর্তী সময়ে নারীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো নারীদের স্বনির্ভরতার জন্য নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। নারীদের কিভাবে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে।

সুন্দরবনের ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দরবনের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সুন্দরবনের নারীসমাজও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাড়ির পুরুষ মানুষগুলো যখন জমিদারদের বিরুদ্ধে মাঠে, খামারে লড়াই করছে, তখন নারীরা তাদের বাবা, স্বামী, সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও ঝাঁটা, বটি, কাটারি নিয়ে গ্রাম পাহারা দিয়েছিল। জমিদারের কাছারি বাড়ি আক্রমনেও পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সুন্দরবনের মেয়েদের উপর জমিদার, পুলিশ, নায়েব, গোমস্তারা অত্যাচার ও নির্যাতন করে এসেছিল, কিন্তু এবার মেয়েরা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে তেভাগা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিল। তাই সুন্দরবনের তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের অবদানকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না।[৩৬]

সুতরাং পরিশেষে এই মন্তব্য করা প্রয়োজন যে, সুন্দরবনের মেয়েদের পাশাপাশি উদ্বাস্তু মেয়েরা সবদিক থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাকেন্দ্রিক দেশভাগ নারীমুক্তির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। কারণ এতদিন পর্যন্ত নারীরা ঘরবন্দি ছিল, কিন্তু এই ঘরবন্দি মেয়েরা দেশভাগের পর আর্থিক সঙ্কট থেকে পরিবারকে মুক্ত করার

জন্য বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিল। এই পদক্ষেপ উদ্বাস্তু নারীদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একধাব এগিয়ে দিয়েছিল। তবুও আজও পর্যন্ত মেয়েদের সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। সর্বোপরি নারীদের ভোটাধিকারও এই সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারেনি।

তথ্যসূত্রঃ

১. সুব্রত রায়চৌধুরি, দেশভাগ স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ (কলকাতা: তথ্যসূত্র, ১৪২৭), পৃ-৫৫

২. শ্যামলী গুপ্ত, বঙ্গনারীর প্রগতিপ্রবাহ (কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২), পৃ-৫৬

৩. তুষার কাঞ্জিলাল, তাহাদের কথা (কলকাতা: সহযাত্রী প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ-২

৪. প্রণব সরকার, চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য রচনা (কলকাতা: লোক, ২০১৩), পৃ-২০৩

৫. তদেব, পৃ- ২০৪

৬. ভবশেখর মণ্ডল, অভিমুখ সুন্দরবন, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: অভিমুখ প্রকাশনী, ২০২০), পৃ- ১৯৮

৭. Protect Sundarban, Harmony between development and conservation is essential for your own existence and sustenance, sundarban Biosphere Reserve, Government of west Bengal, P.11.

৮. প্রণব সরকার, চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য রচনা (কলকাতা লোক, ২০১৩), পৃ-২০৫।

৯. ভবশেখর মণ্ডল, অভিমুখ সুন্দরবন, প্রথম খণ্ড (কলকাতা অভিমুখ প্রকাশনী, ২০২০), পৃ- ২০০

১০. শশাঙ্ক মণ্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন (কলকাতা পুনশ্চ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ- ৩১

১১. মায়া বাসন্তী, সুন্দরবন স্বাধীনতার আগে ও পরে (কলকাতা জোনাকি, ১৪২৩), পৃ- ৬৫

১২. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপ ভূমি সুন্দরবন (কলকাতা ছোঁয়া, ২০২০), পৃ- ৮৪৪

১৩. অঙ্কিতা মান্না, সুন্দরবনের বালি দ্বীপের নারী জীবিকা ও শিক্ষা একটি প্রতিবেদন (কলকাতা: কৃষ্ণা ট্রাষ্ট, ২০১৮), পৃ- ১০

১৪. ক্ষেত্র সমীক্ষাঃ দূর্গারানী মাঝী, বয়স- ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গোসাবা, পেশা- মীন ধরা, তারিখ-২৫.০১.২০২২

১৫ অঙ্কিতা মান্না, সুন্দরবনের বালি দ্বীপের নারী জীবিকা ও শিক্ষা একটি প্রতিবেদন (কলকাতা: কৃষ্ণা ট্রাষ্ট, ২০১৮), পৃ- ১০

১৬. ক্ষেত্র সমীক্ষাঃ অনিতা মন্দল, বয়স- ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গোসাবা, পেশা- মীন ধরা, তারিখ-২৫.০১.২০২২

১৭. আশিস হীরা, দেশভাগ ও নারী ভাঙা দেশ নতুন গড়ন (কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১), পৃ- ২২৩

১৮. জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৫, পৃ-৪২

১৯. National Geographic. Tiger vs. Humans. 2009. Available at: http//www.news.nationalgeographic.com/news/2009/05/090504-sunderbans-tigersvideo-ap.html. Retrieved on 26.02.20

২০. Mallick J.K, Ecology, Status of the Mammal Fauna in Sundarban Tiger Reserve, West Bengal, India, Taprobanica.2011, p- 52-58.

২১. শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের জল-জঙ্গলজীবীদের বিধবা (কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০২০), পৃ-১২

২২. তদেব, পৃ- ১০৭

২৩. তদেব, পৃ-১০৮

২৪. ক্ষেত্র সমীক্ষাঃ নাম- ময়না সাহা, বাসস্থান- ক্যানিং, বয়স-৭২, পেশা- সবজি বিক্রেতা, প্রসঙ্গ- বিধবাদের জীবন সংগ্রাম, তারিখ- ১৭.০৩.২০২২, সকাল- ১০টা

২৫. ক্ষেত্র সমীক্ষাঃ নাম- পুস্পা গায়েন, বাসস্থান- ক্যানিং, বয়স-৭২, পেশা- সবজি বিক্রেতা, প্রসঙ্গ- বিধবাদের জীবন সংগ্রাম, তারিখ- ১৭.০৩.২০২২, সকাল- ১১টা

২৬. শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের জল-জঙ্গলজীবীদের বিধবা (কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০২০), পৃ-৫৯

২৭. মত্তদুদুর রহমান, সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকা নিরাপত্তা (খুলনা, বাংলাদেশ: সেন্টার ফর কোষ্টাল এনভায়রণমেন্টাল কনজারভেশন, ২০১৫), পৃ-১২৬

২৮. সাক্ষাৎকার, প্রতিমা মিশ্র, সভানেত্রী, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ-১২.০৯.২১।

২৯. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপ ভূমি সুন্দরবন (কলকাতা ছোঁয়া, ২০২০), পৃ- ৬০৭

৩০. মুখপত্র, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫, পৃ-১০

৩১. সাক্ষাৎকার, অপর্ণা মাইতি, শ্রমিক, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ-১২.০৯.২১

৩২. সাক্ষাৎকার, ভারতী মণ্ডল, শ্রমিক, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ-১২.০৯.২১

৩৩. মুখপত্র, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫, পৃ-১০

৩৪. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, মুখপত্র, '*এক দশক*', বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৃ-১০

৩৫. তদেব, পৃ- ৩

৩৬. বরেন্দু মণ্ডল, দ্বীপ ভূমি সুন্দরবন (কলকাতা ছোঁয়া, ২০২০), পৃ- ২১৭।

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণাপত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ করে পরিশেষে বলা যায় যে, সুন্দরবনের পরিবেশ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের নিম্নবর্গের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক, ভৌগোলিক এবং মূলত পরিবেশগত ইতিহাস নিয়ে নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে আলোচনা করেছি। এই অঞ্চলের প্রান্তিক নিম্নবর্গের পরিবেশগত ইতিহাস খুবই কম। দীপেশ চক্রবর্তী বলেছেন এই বিশ্বায়নের যুগে একদিন হয়তো সত্যিই মানুষের ইতিহাস লেখা হবে, কিন্তু তার প্রেক্ষাপট হবে জীবনের ইতিহাস। অর্থাৎ সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের দার্শনিক দিকের বাস্তবিক প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস বলতে সামাজিক পরিকাঠামোর একপ্রান্তে অবস্থিত শোষিত, বঞ্চিত শ্রেণীকেই বলা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাপত্রে সুন্দরবনের অসহায়, দারিদ্র, সহায়সম্বলহীন প্রান্তিক নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এদের সামগ্রিক পরিবেশ আজ বিপন্ন এবং এদের এই বিপন্নতা পৃথিবীর পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনবে, কারণ বাস্তুতন্ত্রের সমগ্র পরিকাঠামোটি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। জীববৈচিত্র্যে পূর্ণ পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন প্রকৃত অর্থে একটি উন্নয়নশীল বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। শুধু তাই নয় সুন্দরবন বিশ্বব্যাপী এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা যার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো বহু মানুষ ও প্রাণীজগতের বাস্তুসংস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এই উন্নয়নশীলতার পথে নানা সময়ে নানা ধরণের বাধার সৃষ্টি হয়েছে, কখনও আন্দোলন রূপে, কখনও বিভাজন রূপে, কখনও উন্নয়নের প্রতীক রূপে। এই বাধায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে

নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষদের। তাদের লাঞ্ছনার ইতিহাস বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বিভাজনের আগে এবং পরে এই নিম্নবর্গের দলিত শ্রেণীর মানুষকে যেভাবে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা চলেছিল তার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবে মরিচঝাঁপির ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ভারতে সবসময় উচ্চবর্ণের নেতৃবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের দাবী অবদমিত হয়েছে। তাই দেশভাগের ফলে দলিত নিম্নবর্গের মানুষরাই সবথেকে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার শিকার হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় এই উদ্বাস্তুরা সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ। তারা প্রধানত চাষি, জেলে, দিনমজুর শ্রেণীভুক্ত। তাই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণেই সরকার গরিব অসহায় গৃহহীনদের সম্পূর্ণ উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ ভাবে উন্নয়ন করতে না পারলেও নানা ধরণের প্রকল্প রূপায়ণ করেছিল, যার বিশ্লেষণ এই গবেষণাতে করেছি। এই সকল সরকারি কার্যকলাপের ইতিবাচক দিকগুলি যথাসম্ভব তুলে ধরেছি। তবুও আমার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজের সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়েছে, এর জন্য দায়ী ভারত তথা বাংলার ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, যথার্থ কর্মসংস্থানের অভাব, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি বাস্তুতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টিহীনতা।

সুন্দরবনের বনসম্পদকে কেন্দ্র করে একটি চক্রাকার বৃত্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যার একদিকে আছে সুন্দরবনের বনসম্পদ এবং অন্যদিকে আছে সেই সম্পদ আহরণের দ্বারা নিজেদের জীবনকে সচল রাখা জনগোষ্ঠী। আর এই দুইয়ের মাঝে আছে দুইজনের উন্নয়নকারী সংস্থা বা সরকার। যাদের উদ্দেশ্যে হল বনসম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ করা, সেই সাথে সম্পদ আহরণকারী মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়া। কিন্তু মানুষের নির্ভরযোগ্য কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে সরকারী বাধা অমান্য করে, নিজের জীবনকে বিপন্ন করে

তারা ছুটে যায় বনসম্পদ আরহণে। সুন্দরবনের নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য বহির্ভূত উপাদান হিসাবে সাহিত্যের অবদানের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সুন্দরবনের মানুষের দুঃখ ও আনন্দের ইতিহাস রচিত হয়েছে। সুন্দরবনের পরিবেশ মানে যে শুধুমাত্র জঙ্গল, পশুপাখি নয়, সেখানে মানুষেরও যে সমান গুরুত্ব আছে, এই বাস্তব সত্যতার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনে জলসম্পদের ভূমিকা দ্বারা বাস্তব জীবনকে চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়েছে। সুন্দরবনের নদীকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের বহু নারী তাদের জীবন অতিবাহিত করছে। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে আজও প্রান্তিক নারীদেরও যে একটা অবদান আছে সেই কথাটা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যে, পিতৃতান্ত্রিক নানা অবহেলা, অত্যাচার সত্ত্বেও এই অঞ্চলের মেয়েরা হার মানেনি, এক কথায় এরা হার মানতে শেখেনি। আলোচ্য এই বিষয় নিয়ে এখনও অনেক গবেষণা বাকি, ভবিষ্যতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে এই ধরণের গবেষণার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমার গবেষণা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হবে বলে আমার মনে হয়।

আশার বিষয় এই যে, World Wildlife Fund India (WWF-India) ২০১১ সালে সুন্দরবনের উন্নয়ন পর্ষদের সাথে যৌথ ভাবে Vision Document বা ভবিষ্যতের প্রকল্প তৈরি করেছে। যার ফলে এই বদ্বীপের মানুষ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) সম্ভবপর হবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ২০১১ সাল যেখানে আমার গবেষণাপত্র সমাপ্ত করছি তার পরেও বুলবুল (২০১৯), আমফান (২০২০০, যশের (২০২১) মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে পড়েছে। উপরন্তু ২০২০-২০২২ সালে ভয়াবহ করোনা মহামারীতে সুন্দরবনসহ গোটা ভারতবর্ষের মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আশাকরি এই সব বাধা অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সুন্দরবন আরও উন্নত হবে এবং সমগ্র বিশ্বের জীবনধারণের জন্য নতুন দিশা দেখাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

মুখ্য উপাদান

ক) সরকারি নথিপত্র ইংরাজি

১. Annual Report on the Working of the Registration Department, Government of West Bengal, 1948

২. Annual Report on the Working of the Registration Department, Government of West Bengal, 1950

4. Administrative Report 2008-2009, Sundarban Affairs Department, Government of West Bengal, Mayukh Bhavan, (1st Floor Saltlake City) Kolkata.

৩. Administration and Organization for Rural Development in Sundarbans, Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal.

৪. Census of India 1951, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৫. Census of India 1961, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৬. Census of India 1991, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৭. Census of India 2001, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৮. Census of India 2011, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৯. District Census Hand Book: South 24 Parganas, Government of West Bengal, Vol-2, 1961.

১০. District Statistical Hand Book, South 24 Parganas, 1995, Government of West Bengal

১১. District Statistical Hand Book, South 24 Parganas, 2007, Government of West Bengal

১২. De Barun, West Bengal District Gazetteers, South 24 parganas, March 1994, government of west Bengal.

১৩. Dutta B, 'West Bengal Panchayat Manual', Kamal Law house, 2003

১৪. Government of West Bengal. 2005. Sundarbans Development Board. Administrative Report: 2004-2005. Sundarbans Development Board, Sundarbans Affairs Department, Government of West Bengal.

১৫. Government of India. 2006. Sundarban Tiger Reserve. Annual Report: 2005-2006. Field Director Sundarbans Tiger Reserve.

১৬. Government of West Bengal Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol. 1, 2001.

১৭. Hunter, W.W. – A Statistical Account of Bengal – 24 Parganas and Sundarbans – Vol 1, Trubner and Company, London, 1875.

১৮. Hunter, W.W. – The Imperial Gazetteer of Bengal: 1903 1904.

১৯. Lahiri, Anil Chandra – Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of 24 Parganas. 1924-33. Calcutta, 1936.

২০. Lal's commentaries on Water and Air Pollution and Environment (protection) Laws, 4th edition, revised by mc Mehta, Delhi Law House, 2000.

২১. Letter to Minister-in-Charge, Department of Forest & Environment, Government of W.B.

২২. Mandal A.K. and Nandi N.C, Fauna of Sundarban Mangrove Ecosystem, west Bengal, India, Zoological Survey of India, 1989

২৩. Mitra, S.K, Handbook on the Kolkata Municipal Corporation Act, 1980.

২৪. O'Malley, L.S.S, Bengal District Gazetteers 24 Parganas, Calcutta 1914 (Reprint 1998).

২৫. Protect Sundarban, Harmony between development and conservation is essential for your own existence and sustenance, Sundarban Biosphere Reserve, Government of West Bengal.

২৬. Report on the Land Revenue Administration of Bengal: Land and Land Revenue Department, Govt. Of West Bengal, West Bengal State Archives.

২৭. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. I-IV.

২৮. Report on the Land Revenue Administration of Bengal: Land & Land Revenue Department, Govt. of West Bengal West Bengal State Archives.

২৯. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (As modified up to 1st November, 1990), Government of India, Ministry of Law and Justice.

৩০. Tenth Five Year Plan, 2002-2007, Volume-I, Inclusive Growth, Planning Commission, Government of India, New Delhi, Chapter-9, Environment and Climate Change.

৩১. The Constitution of India, Article 48A, government of India, ministry Of Law and Justice, New Delhi, 2005.

৩২. WWF Report India, Sundarbans: Future Imperfect, Climate Adaptation Report, 2010.

খ) সরকারী নথিপত্র বাংলা

১. নবরূপে পঞ্চায়েতী রাজ, বিশেষ সংখ্যা, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৯

২. রিপোর্ট, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১১

৩. *'সুন্দরবন উন্নয়নে সামাজিক বনসৃজনের ভূমিকা'*, সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার'

৪. সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫. সাহা, মনোজ কুমার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা-১৪০৬*, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০

৬. সুন্দরবন দিবস ২০১৪, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১ ডিসেম্বর, ২০১৪।

৭. সত্যানন্দ দাস, '*সুন্দরবন সংরক্ষণ*', বনাধিকারীক, সামাজিক বনসৃজন বিভাগ, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ।

৮. সুন্দরবন বিষয়ক, বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মে-জুলাই,২০১৭

৯. সুন্দরবনের উন্নয়ন, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

১০. সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী কৃষি যন্ত্রপাতি ও মৎস্য- সংক্রান্ত শুমারি, প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩।

গ) বেসরকারি নথিপত্র ইংরাজি

১. Annual report of Joygopalpur Gram Vikash Kendra, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans, Basanti, South 24 Parganas, 2010

২. Annual report of Joygopalpur Gram Vikash Kendra, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans, Basanti, South 24 Parganas, 2009-2011,

৩. Educational Tourism in the Sundarbans, Joygopalpur Gram Vikash Kendra, Basanti, South 24 Parganas,

৪. Annual report of Joygopalpur Gram Vikash Kendra 2009-2010, creating a difference in the lives of the poor in Sundarbans

৫. An Overview of Joygopalpur Gram Vikash Kendra, Basanti, August 2018.

৬. Annual Funding Agencies, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009.

৭. Annual health report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2011

৮. An overview of Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, August 2011

৯. Annual report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2011

১০. Annual report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2009-2010

১১. Annual report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2010-2011

১২. Planning Report, Tagore Society for Rural Development, Rangabelia, 2001

১৩. Sundarban Fertilizers Limited: Prospects & Project Profile (For Private Circulation Only).

ঘ) বেসরকারি নথিপত্র বাংলা

১. কম্পাস, টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুখপত্র, তুষার কাঞ্জিলাল সংখ্যা, ৫৭ বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১

২. জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, মুখপত্র, '*এক দশক*', বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,

৩. পরিবেশ বিষয়ক মাসিক, '*আজকের বসুন্ধরা*', জানুয়ারি ২০১৮

৪. মুখপত্র, টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, ২০১৫

ঙ) দৈনিক সংবাদপত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৬ জুন, ১৯৭৫

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২২ জুন, ১৯৭৫

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮

৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯১

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২০ মে, ১৯৭৯

৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ৮ মার্চ, ১৯৪৮

৭. অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১০ মার্চ, ১৯৪৭

৮. কালান্তর, কলকাতা, ২৬ ফেব্রয়ারি, ১৯৭৯

৯. দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা, কলকাতা, ৩১ মার্চ, ১৯৭৮

১০. দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা, কলকাতা, ৬ নভেম্বর, ২০০২

১১. দ্য হিন্দু, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩

১২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৫ মার্চ, ২০১৬

১৩. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৪ এপ্রিল, ২০১৪

১৪. যুগান্তর, কলকাতা, ১৬ই মে, ১৯৬৪

১৫. যুগান্তর, কলকাতা, ২১ জুন, ১৯৭৮

গৌণ উপাদান

ক) সহায়ক ইংরাজি বই

১. Bhattacharyya, Amit. & Sarkar, Mahua. eds. 'History and the Changing Horizon Science, Environment and Social Systems. Kolkata: Setu Prakashani, 2014.

২. Barman, Rup Kumar. Fisheries and Fishermen, A socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal. Delhi: Abhijeet Publication, 2008.

৩. Banerjee, Anuradha. 'Environment, Population and Human Settlements of sundarban Delta. New Delhi: Concept Publishers, 1998.

৪. Chatterjee, Joya. The spoils of partition: Bengal and India 1947-1967. New Delhi: Cambridge University, 2007.

৫. Chakrabarti, Prafulla. The Marginal Men: The Refuges and the Left Political Syndrome in West Bengal. Kalyani: Lumiere Books, 1990.

৬. Chakrabarti, Ranjan. Taming the Man-eaters of the Sundarbans 1880-1947. Visva Bharati Annals: New Series, April 2004.

৭. Choudhury, Tanmay. The Sundarbans the Hinterland of Wilderness. Kolkata: Charchapada, 2011.

৮. Guha, Ramachandra. Environmentalism: A Global History. London: Longmans Publications, 2000.

৯. Ghoshal, Anindita. Refugees, Boarder and Identities: Rights and Habitat in East Northeast India. South Asia Edition. Routledge, 2021.

১০. Ghosh, Asish. Environmental Conservation Challenges & Actions. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 2008.

১১. Ghosh, Amitav. 'The Hungry Tide. New York: Harper Collins, 2005.

১২. Hunter, WW. Statisical Account of Bengal', (Districts of the 24 Parganas and Sundarbans). Vol.1. London: Trubner and Company, 1875.

১৩. Jalais, Annu. Forests of Tigers: people, Politics and Environment in the Sundarbans. New Delhi: Routledge, 2010.

১৪. Kanjilal, Tushar. Who Killed the Sundarbans? Kolkata: Tagore Society for Rural Development, 2000.

১৫. Kumar, Vikas. Social Forestry in India: Concept and Schemes. Tropical Forest research Institute. Vol.2, 2015.

১৬. Mukherjee, Biswajit. & Ray, Rahul. Environmental Awakening. Kolkata: Sikha Books, 2005.

১৭. Sarkar, Mahua. ed. Environment and History Recent Dialogues. Delhi: Kalpaz Publications, 2008.

১৮. Sarkar, Sutapa Chatterjee. The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals. New York: Routledge, 2017.

১৯. Wiersum, K.F. 'Social Forestry: Changing Perspectives in Forestry Science or Practice? Netherlands: Wageningen Agricultural University, 1999.

খ) সহায়ক বাংলা বই

১. আহমেদ রাজিব, সুন্দরবনের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ: গতিধারা, ২০১২।

২. কাঞ্জিলাল তুষার, পথে-প্রান্তরে, কলকাতা: প্রজন্ম প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৩. কাঞ্জিলাল তুষার, *তাহাদের কথা,* কলকাতা: সহযাত্রী প্রকাশনী, ২০১৩।

৪. কাঞ্জিলাল তুষার, সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, কলকাতা: আজকাল, ২০১৬।

৫. গোস্বামী মালবিকা, সুন্দরবনের জীবন, জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, ২০০০।

৬. গুপ্ত শ্যামলী, বঙ্গনারীর প্রগতিপ্রবাহ, কলকাতা: ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২।

৭. গুহ বুদ্ধদেব, বনবিবির বনে, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৭৯।

৮. গুহ সত্যানন্দ, সুন্দরবনের সুন্দরী, কলকাতা: শশধর, ১৯৯১

৯. ঘোষাল ইন্দ্রাণী, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৬।

১০. ঘোষাল ইন্দ্রাণী, বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গ্রন্থন প্রকাশনী, ২০০৪।

১১. ঘোষ পূর্নেন্দু, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং, কলকাতা: লোকসখা, ২০১৭।

১২. চক্রবর্তী রঞ্জন এবং মিস্ত্রী ইন্দ্রকুমার, সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, কলকাতা: রিসা রির্ডাস সার্ভিস, ২০০৭।

১৩. চক্রবর্তী গৌরাঙ্গ, 'কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: সেরিবান, ২০০৪।

১৪. চক্রবর্তী কল্যাণ এবং রায়চৌধুরী বিশ্বজিত, বনে বনে বেড়াই, কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০।

১৫. চক্রবর্তী কল্যাণ, মানুষ ও বাঘ, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮৮।

১৬. চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জীবনের কথা, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩।

১৭. চক্রবর্তী বিমল, অদ্বৈত মল্লবর্মনঃ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার, ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশন, ২০১২।

১৮. চক্রবর্তী শশধর, বিস্ময়ে ভরা সুন্দরবন, উত্তর চব্বিশ পরগনা: ১৯৯৮।

১৯. চক্রবর্তী সত্যরঞ্জন, স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫০-২০১১, কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৫।

২০. জলীল এ.এফ.এম. আবদুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, বাংলাদেশ: লিঙ্কম্যান পাবলিকেশন, ১৯৬৭।

২১. জানা দেবপ্রসাদ, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৫।

২২. দাস গোকুলচন্দ্র, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।

২৩. দাস জয়দেব ও নায়েক অমল, অজানা সুন্দরবন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: চম্পা মহিলা সোসাইটি, ২০১৫।

২৪. দাস নির্মলেন্দু, সুন্দরবনের লোক সংস্কৃতি, কলকাতা: জ্ঞান, ১৯৯৬।

২৫. দাস মলয়, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১।

২৬. দাস মলয়, সুন্দরবনের জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১।

২৭. দাস সুবর্ন, সুন্দরবন অঞ্চলের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবন চরিত, কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, ২০০৯।

২৮. দাস শচীন, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭।

২৯. দত্ত সৌমেন, গোসাবার ডাক্তার বাবু, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৪।

৩০. দত্ত সৌমেন, প্রেক্ষাপট সুন্দরবন, কলকাতা: আজকাল, ২০১০।

৩১. দত্ত সন্দীপ, লিটিল ম্যাগাজিনে দেশভাগ, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৮।

৩২. দে রহীন্দ্রনাথ, সুন্দরবন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

৩৩. নস্কর কুমুদরঞ্জন, সুন্দরবন প্রকৃতির প্রতিশোধ, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৬।

৩৪. নস্কর ধূর্জটি, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ, ১তম খণ্ড, কলকাতা: শ্যামলী, ১৯৯৭।

৩৫. নস্কর ধূর্জটি, সুন্দরবন সভ্যতার ইতিহাস, কলকাতা: শ্যামলী, ২০০০।

৩৬. প্রামাণিক শঙ্করকুমার, সুন্দরবন-জল-জঙ্গল-জীবন, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৮।

৩৭. প্রামাণিক শঙ্করকুমার, সুন্দরবনের জল-জঙ্গলজীবীদের বিধবা, কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০২০।

৩৮. প্রামাণিক শঙ্করকুমার, জনজীবন কাঁকড়ামারা মাছধরা আর মৌলে, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৭।

৩৯. প্রামাণিক শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের বাঘ বিধবা, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১।

৪০. বর্মন প্রদীপকুমার, বাঘের রাজত্বে সুন্দরবন বিষয়ক গল্পসমূহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১২।

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় ডালিম কুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার, কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০।

৪২. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, সুন্দরবনের আতঙ্ক, কলকাতা: দে'জ, ১৯৭৭।

৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার, পৃথিবীর নদনদী, কলকাতা: একুশ শতক, ২০১০।

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপকুমার, বাংলার নদনদী, কলকাতা: দে'জ, ২০০৭।

৪৫. বন্ধ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, মরিচঝাঁপি : দণ্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবন, কলকাতা: ঋতাক্ষর, ২০১০।

৪৭. বসু বিশ্বনাথ, অভিশপ্ত সুন্দরবন, কলকাতা: অরুনা, ১৩৭৬।

৪৮. বেরা বিনোদ, সুন্দরবনের সুখ দুঃখ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ব-দ্বীপ বার্তা, ২০০৩।

৪৯. বাসন্তী মায়া, সুন্দরবন স্বাধীনতার আগে ও পরে, কলকাতা: জোনাকি, ২৫শে বৈশাখ, ১৪২৩।

৫০. ভদ্র গৌতম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৮।

৫১. মল্লবর্মন অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা: পুঁথিঘর, ১৪১৮।

৫২. মণ্ডল অনুকূল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা: দেশী বুক এজেন্সি, জুলাই ২০১৮।

৫৩. মণ্ডল কৃষ্ণকালী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়, কলকাতা: ক্রান্তিক, ১৯৯৯।

৫৪. মণ্ডল চিত্তরঞ্জন, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন গোসাবা এজেন্টঃ কৃষক আন্দোলনের তথ্যানুসন্ধান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ডিজিটাল ক্যানভাস, ২০১৮।

৫৫. মণ্ডল, জগদীশচন্দ্র, মরিচঝাঁপি নি:শব্দের অন্তরালে, কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০২।

৫৬. মণ্ডল, জগদীশচন্দ্র, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃকারা এবং কেন?, কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫।

৫৭. মণ্ডল দেবজ্যোতি, সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৬।

৫৮. মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-১ যুগ্ম সংখ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৫।

৫৯. মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-২ যুগ্ম সংখ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৬।

৬০. মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা (দ্বিতীয় খণ্ড), দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০০৮।

৬১. মণ্ডল ভবশেখর, অভিমুখ সুন্দরবন, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: অভিমুখ প্রকাশনী, ২০২০।

৬২. মণ্ডল বরেন্দু, দ্বীপভূমি সুন্দরবন, কলকাতা: ছোঁয়া, ২০২০।

৬৩. মণ্ডল বরেন্দু, সুন্দরবন ও আমাদের কথা, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫।

৬৪. মণ্ডল বরেন্দু, সুন্দরবনের স্মৃতি, কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫।

৩৫. মণ্ডল শশাঙ্ক, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, কলকাতা: পুনশ্চ প্রকাশনী, ১৯৯৫।

৬৬. মণ্ডল স্বপনকুমার, সুন্দরবন, কলকাতা:কথা, ২০১১।

৬৭. মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন, কলকাতা: কথা শিল্প, বঙ্গাব্দ ১৩৬৮।

৬৮. মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮৮।

৬৯. মিত্র সতীশচন্দ্র, 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯২২।

৭০. মাদুদ মুস্তাফিজ, দেখুন সুন্দরবন, বাংলাদেশ: অবসর, ২০১২।

৭১. রুদ্র কল্যাণ এবং লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ন, 'ভারতীয় সুন্দরবন একটি ভৌগোলিক রূপরেখা, কলকাতা: আনন্দ, ২০২১।

৭২. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব(প্রথম পর্ব), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, তৃতীয় সংস্কার ১১ই মাঘ, ১৩৮৬।

৭৩. রায়চৌধুরী সুব্রত, দেশভাগ স্মৃতি ও সত্তার বিষাদ, কলকাতা: তথ্যসূত্র, ২৫ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০২০।

৭৪. রায় মোহিত, 'পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন, পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা: অনুস্তপ, ২০১৫।

৭৫. রসুল আবদুল্লাহ, কৃষক সভার ইতিহাস, কলকাতা: নবজাতক, ১৯৭৮।

৭৬. রহমান মত্তদুদুর, সুন্দরবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকা নিরাপত্তা, খুলনা, বাংলাদেশ: সেন্টার ফর কোষ্টাল এনভায়রণমেন্টাল কনজারভেশন, ২০১৫।

৭৭. রহমান মত্তদুদুর, জীবন জীবিকা ও জীব বৈচিত্রের ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, খুলনা, বাংলাদেশ: সেন্টার ফর কোষ্টাল এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন, ২০১৫।

৭৮. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, সুন্দরবনের অনধিকার চর্চা, কলকাতা: রংরুট হলিডেইয়ার, ২০১৫।

৭৯. শেখ মো.আবু হানিফ, বাংলাদেশের নদ-নদী ও নদী তীরবর্তী জনপদ, বাংলাদেশ: অবসর, ২০১৬।

৮০. শফিক মাহমুদ, ‘পরিবেশ উন্নয়ন ও সুন্দরবন’, ঢাকা, বাংলাদেশ: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ২০১৭।

৮১. সেনগুপ্ত অভিজিৎ, সুন্দরবনের ডায়েরি, কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১০।

৮২. সেনগুপ্ত সুধীর, সুন্দরবন জীব- পরিমণ্ডল, কলকাতা: আনন্দ, ২০০৫।

৮৩. স্বামী গম্ভীরানন্দ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী-১, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৮।

৮৪. সরকার দয়ালচাঁদ, ‘বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে নদ-নদী’, কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, ২০১৬।

৮৫. সরকার প্রণব, চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনা, কলকাতা: লোক, ২০১৩।

৮৬. সরকার প্রণব, স্বদেশ চর্চা লোক, সেকালের পথঘাত-১, কলকাতা: লোক, ২০০৬।

৮৭. হারী আশিস, দেশভাগ ও নারী ভাঙা দেশ নতুন গড়ন, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১।

৮৮. হোসেন মোশারফ, সুন্দরবন বৈচিত্র্যের অপর নাম, বাংলাদেশ: বিদ্যপ্রকাশ, ২০০৬।

গ) পত্র-পত্রিকা

১. কেমন আছে সুন্দরবনের মানুষ, আয়লা পরবর্তী একটি সমীক্ষা, মন্থন সাময়িকী, নভেম্বর, ২০১০।

২. পর্যটন সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০১।

৩. নীল লোহিত- বিশেষ নদী সংখ্যা, নবম সংখ্যা, সম্পাদক- বিশ্বাস বিপ্লব, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০১।

৪. যোজনা ধনধান্যে, উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা, দীপিকা কাচ্ছাল, কলকাতা, মে, ২০১৫।

৫. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "সুন্দরবনের নদীবাঁধ", ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর ২০১৭ ও ১৫ জানুয়ারি ২০১৮।

৬. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "বিধ্বংসী বুলবুল", হুগলী, জানুয়ারি, ২০২০।

৭. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "সুন্দরবনের বাঘ", পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ এপ্রিল, ২০১৭।

৮. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "সুন্দরবন গবেষণার অগ্রপথিকেরা", হুগলী, জুলাই-অক্টোবর, ২০১৯।

৯. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "সুন্দরবনের বৃষ্টি...বৃষ্টির সুন্দরবন", পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জুলাই, ২০১৭।

১০. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "মানচিত্রে সুন্দরবন", হুগলী, জুলাই-অক্টোবর, ২০১৮।

১১. লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, শুধু সুন্দরবন চর্চা, "বাদাবনের বিপন্ন কামট", হুগলী, জুলাই-অক্টোবর, ২০২০।

১২. সরকার প্রণব, স্বদেশচর্চা লোক, "বাংলার নদনদী, জলাশয় সংখ্যা-১", কলকাতা, ২০১৩।

১৩. সরকার প্রণব, স্বদেশচর্চা লোক, "সেকালের পথঘাট-১", কলকাতা, ২০০৬।

১৪. সরকার প্রণব, স্বদেশচর্চা লোক, "সেকালের পথঘাট-২" কলকাতা, ২০০৭।

১৫. সরকার প্রণব, স্বদেশচর্চা লোক, "বাংলার মেলা ও উৎসব", কলকাতা, ২০০৮।

১৬. সামন্ত অরবিন্দ, "সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য তিস্তাপারের বৃত্তান্ত: একটি সমীক্ষা", উত্তরধ্বনি (পত্রিকা), শারদ সংখ্যা ১৪০৯।

১৭. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১", ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি-২০১০।

১৮. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-২", অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১১।

১৯. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৩", নবম সংখ্যা, জুলাই, ২০১১।

২০. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৪", দশম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১২।

২১. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৬", ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৩।

২২. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৭", চতুর্দশ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৪।

২৩. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৮", ষোড়শ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৫।

২৪. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-৯", সপ্তদশ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৫।

২৫. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১০", সপ্তদশ, সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৬।

২৬. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১১", উনবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৭।

২৭. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১২", বিংশ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৭।

২৮. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি-১৩", দ্বাবিংশ সংখ্যা, জুলাই ২০১৮।

২৯. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০০৮।

৩০. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "সুন্দরবনে আয়লা", পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই, ২০০৯।

৩১. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-২", দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৮।

৩২. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৩", চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০০৯।

৩৩. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৪", সপ্তম সংখ্যা, জুলাই, ২০১০।

৩৪. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৫", দ্বাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৩।

৩৫. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৬", পঞ্চদশ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৪।

৩৬. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৭", অষ্টাদশ সংখ্যা, জুলাই, ২০১৬।

৩৭. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৮", একবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৮।

৩৮. হালদার বিমলেন্দু, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, "নদী সংখ্যা-৯", জানুয়ারি, ২০২০।

ঘ) সাক্ষাৎকার

১) নাম- গোলাম হোসেন, গ্রাম-ইটাভাটি, পোঃ- বাসন্তী, থানা- বাসন্তী, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা বয়স- ৫৫, পেশা- মাঝি, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণী, তাং- ১২.১১.২০১৯, সময়- বিকাল ৫টা

২) নাম- বিশাখা বেরা, গ্রাম- কামার পাড়া, পোঃ- পাঠানখালী, থানা- গোসাবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বয়স- ৫৫, পেশা- নদীতে মীন ধরা। শিক্ষা- নিরক্ষর, তাং- ২৭.০২.২০১৯, সময়- বিকাল ৩.৩০ মিনিট

৩) নাম- রঞ্জিত মণ্ডল, গ্রাম- বিজয়নগর, পোঃ- বিজয়নগর, থানা- গোসাবা, বয়স- ৫০, পেশা- নদীতে কাঁকড়া ও মাছ, তাং- ২৫.১০.২০১৯, সময়- দুপুর ২.২০ মিনিট

৪) নাম- প্রতিমা মিশ্র, সভানেত্রী, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ- ১২.০৯.২১, সময়- দুপুর ১ টা

৫) নাম- রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, Coordinator, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ- ২১.০৩.২২, সময়- দুপুর ১২টা

৬) নাম- বিশ্বজিৎ মহাকুর, সম্পাদক, জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, তারিখ- ১৩.০৩.২০২২, সময়- দুপুর ১.৩০ মিনিট

৭) নাম- দূর্গারানী মাঝী, বয়স- ৭৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গোসাবা, পেশা- মীন ধরা, তারিখ-২৫.০১.২০২২, সময়- দুপুর ২.৪০ মিনিট

৮) নাম- অনিতা মণ্ডল, বয়স- ৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গোসাবা, পেশা- মীন ধরা, তারিখ-২৫.০১.২০২২, সময়- দুপুর ২.৩০ মিনিট

৯) নাম- ময়না সাহা, বাসস্থান- ক্যানিং, বয়স-৭২, পেশা- সবজি বিক্রেতা, প্রসঙ্গ- বিধবাদের জীবন সংগ্রাম। তারিখ- ১৭.০৩.২০২২, সময়- সকাল ১০টা

১০) নাম- পুস্পা গায়েন, বাসস্থান- ক্যানিং, বয়স-৭২, পেশা- সবজি বিক্রেতা, প্রসঙ্গ- বিধবাদের জীবন সংগ্রাম। তারিখ- ১৭.০৩.২০২২, সময়- সকাল ১১টা

১১) নাম- অপর্ণা মাইতি, শ্রমিক, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ- ১২.০৯.২১, সময়- দুপুর ১.৩০ মিনিট

১২) নাম- ভারতী মণ্ডল, শ্রমিক, মহিলা সমিতি, রাঙ্গাবেলিয়া প্রজেক্ট, তারিখ- ১২.০৯.২১, সময়- দুপুর ১.৩০ মিনিট

ঙ) বৈদ্যুতিন মাধ্যম

১. http://library. nothingness.org/articles/anar/en/display/303

২. https://kccollege.ac.in

৩. https://www.ebookbou.edu.bd,

৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Ecology

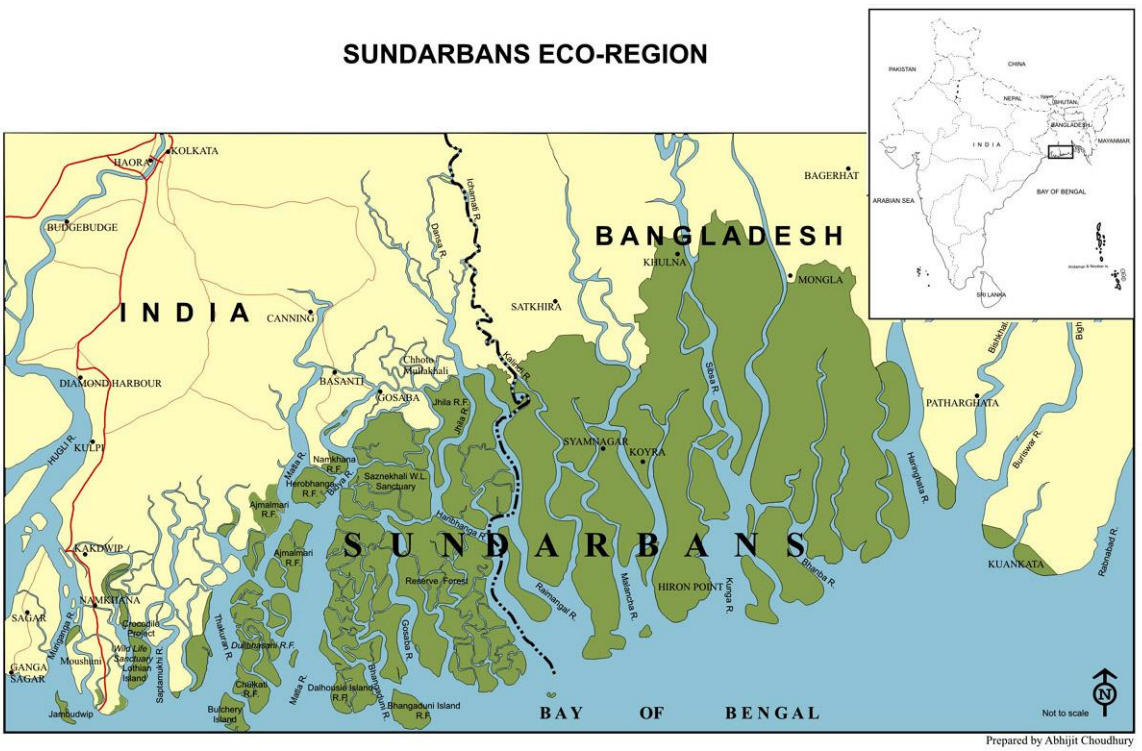

সংযোজনী

SUNDARBANS ECO-REGION

Prepared by Abhijit Choudhury

CENSUS OF INDIA 1951

VOLUME VI—PART III

CALCUTTA CITY

A. MITRA
of the Indian Civil Service,
Superintendent of Census Operations
and
Joint Development Commissioner, West Bengal

PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI.
PRINTED BY THE GOVERNMENT OF INDIA PRESS, CALCUTTA, INDIA.
1954.

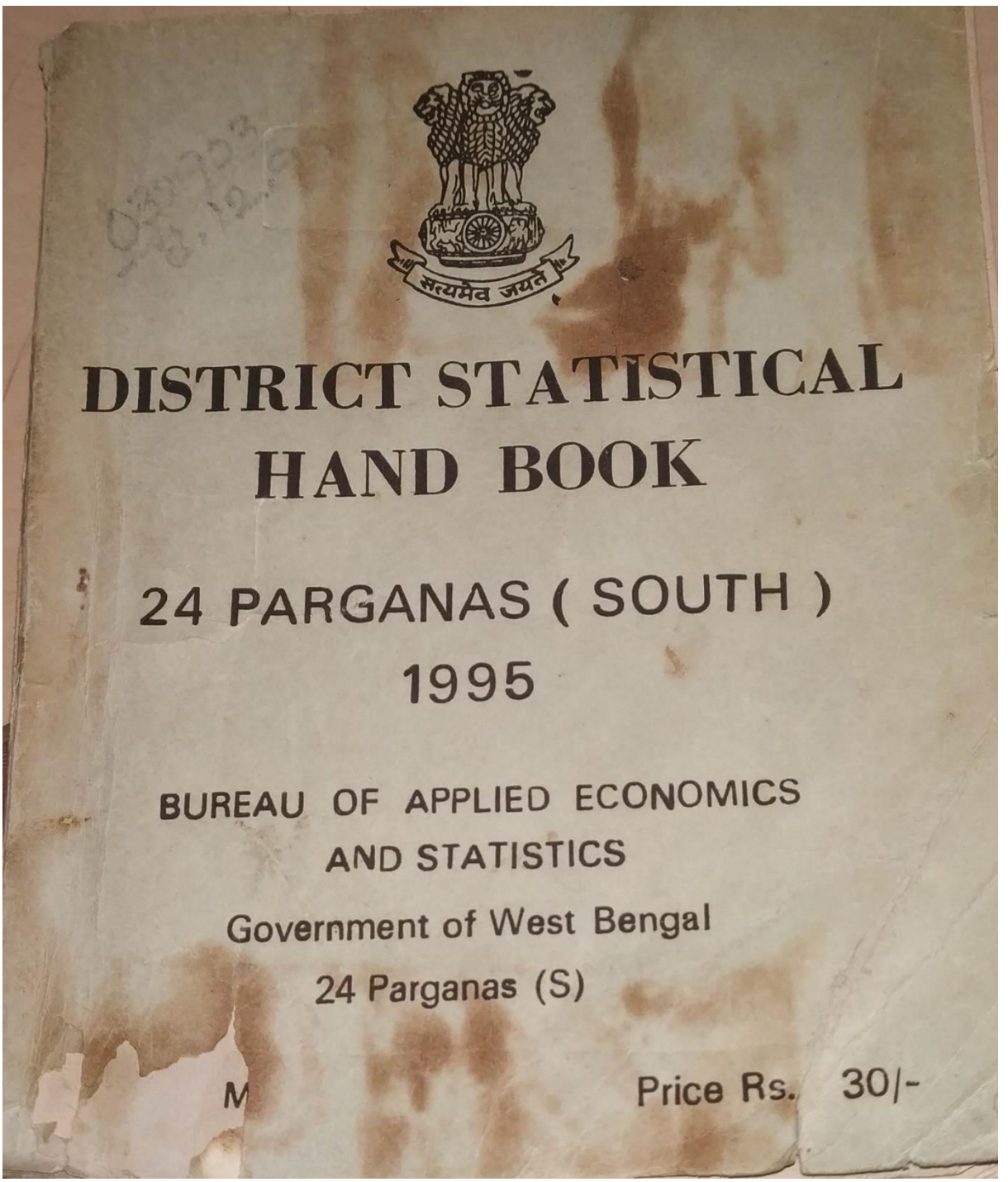
सत्यमेव जयते
DISTRICT STATISTICAL
HAND BOOK
24 PARGANAS (SOUTH)
1995
BUREAU OF APPLIED ECONOMICS
AND STATISTICS
Government of West Bengal
24 Parganas (S)
Price Rs. 30/-

035106
4.4.07

सत्यमेव जयते

17TH ALL INDIA LIVESTOCK CENSUS, AGRICULTURE IMPLEMENTS AND MACHINERY, FISHERY STATISTICS WEST BENGAL

Date of Reference : 15th October, 2003

Published by

Director of Animal Husbandry & Veterinary Services
West Bengal

and

State Livestock Census Officer, 17th Livestock Census, West Bengal
Directorate of Animal Resources & Animal Health
Government of West Bengal
Block - F, 4th Floor, Writers' Buildings, Kolkata- 700 001

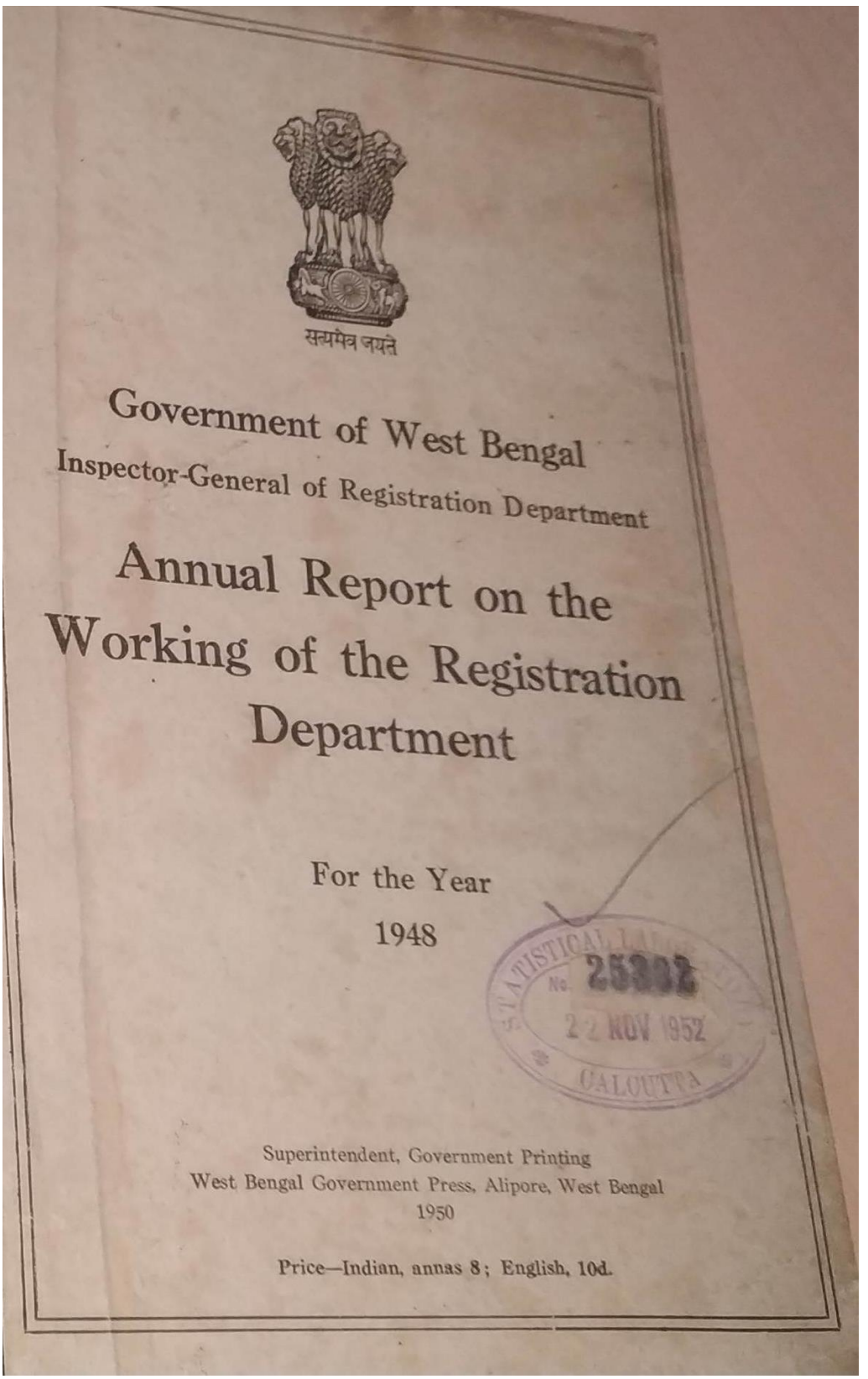

सत्यमेव जयते

Government of West Bengal

Inspector-General of Registration Department

Annual Report on the Working of the Registration Department

For the Year

1948

STATISTICAL LABORATORY
No. 25382
22 NOV 1952
CALCUTTA

Superintendent, Government Printing
West Bengal Government Press, Alipore, West Bengal
1950

Price—Indian, annas 8; English, 10d.

सत्यमेव जयते

Government of West Bengal

Inspector-General of Registration Department

Annual Report on the Working of the Registration Department

25303
CALCUTTA

For the Year

1950

Superintendent, Government Printing
West Bengal Government Press, Alipore, West Bengal
1952

Price—Indian, annas 8; English, 10d.

সত্যমেব জয়তে

সপ্তদশ সর্বভারতীয় গৃহপালিত প্রাণী কৃষি যন্ত্রপাতি ও মৎস্য-সংক্রান্ত শুমারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভিত্তি তারিখ : ১৫ই অক্টোবর, ২০০৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবেদন

৩য় খণ্ড

(প্রেসিডেন্সী বিভাগ)

প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

DISTRICT STATISTICAL HANDBOOK
SOUTH 24-PARGANAS
2007

Bureau of Applied Economics and Statistics
Government of West Bengal

সুন্দরবনে বিপর্যয় পরবর্তী পানীয় জল বিতরণ

নদীর চরে সামাজিক বনায়নে জন্য বৃক্ষরোপণ

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রধান ভূমিকায় সুন্দরবনের নারী সমাজ

এলাকার উন্নয়নে গ্রাম সভা

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সুন্দরবনের মেয়েরা

বাঘের আক্রমণে মৃত জঙ্গলজীবী

সুন্দরবনের মৎস্য চাষ

নদীনির্ভর প্রাত্যহিক জীবন

সুন্দরবনের নদী বাঁধের অবস্থা

মৎস্যজীবীদের জঙ্গলে যাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

গঙ্গা সাগর মেলা

সুন্দরবনের নদীতে খেয়া পারাপার

কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন সুন্দরবনের নারী। নদীতে মীন ধরা।

গোসাবার বিধ্যাধরী নদীর করুণ অবস্থা। নদীর মাঝে জেগে উঠেছে চর।

নদীর জলের উচ্চতা এবং বাঁধের উচ্চতা

নদীর বাঁধ কেটে নোনা জলের ফিসারি

সুন্দরবনের জলে ফেলে দেওয়া বর্জ্য পদার্থের দ্বারা দূষণের মাত্রা

সুন্দরবনের গাছের উপরে তেল দূষণের প্রভাব

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পণ্যবাহী বোট একমাত্র ভরসা পাকাবাড়ি ও রাস্তাঘাটের সরঞ্জাম আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে

এমনভাবে নদীতে নৌকা রেখে জঙ্গলজীবীরা বনে প্রবেশ করে মাছ, মধুর সন্ধানে

সুন্দরবনের মেলা শুধু মেলা নয়। হাজার মানুষের জীবিকার সংস্থান

সুন্দরবনের বাবা বড়কাছারির শিব মন্দিরের মেলা

ক্যানিং মাতলা নদীর অবস্থা

মাতলা নদী এখন ফিসারিতে পরিণত হয়েছে

বিদ্যাধরী নদীর মাঝে জেগে ওঠা নতুন দ্বীপ

মরিচঝাঁপির জঙ্গল

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী গ্রাম

রাতের সুন্দরবন

সুন্দরবনের কঠোর বাস্তবতায় নারীজীবন

বিধবা মহিলাদের অসহায় জীবন ‘ময়না সাহা’ ক্যানিং বাজারের সব্জি বিক্রেতা

অসহায় বিধবাদের জীবন সংগ্রাম ‘পুস্পা গায়েন’ ক্যানিং বাজারের মাছ বিক্রেতা